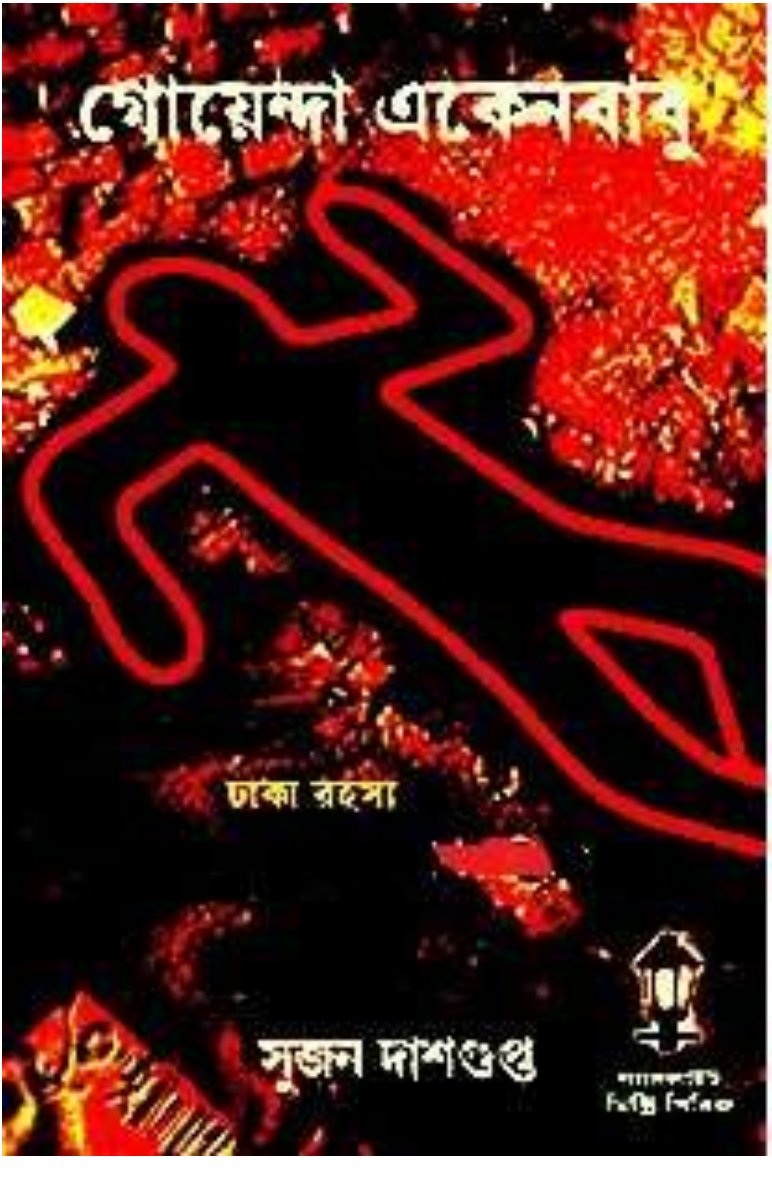

গোয়েন্দা একেনবাবু
ঢাকা রহস্য
সুজন দাশগুপ্ত

সুজন দাশগুপ্তের সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র একেনবাবু। সিরিজটির প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ৯০ দশকের গোড়ায় । প্রথম গল্পটি ছিল 'ম্যানহাটানে মুনস্টোন'। একেনবাবু প্রথমে লেখা হত ছোটদের জন্য। একেনবাবু সেই একই আছেন, শুধু লেখাগুলো এখন আর ঠিক ছোটদের জন্যে নয়।

সিরিজের আরও কিছু বই-

১। ম্যানহাটানে ম্যানহান্ট

২। ম্যানহাটানে মুনস্টোন

৩। ম্যানহাটানের ম্যাডম্যান

৪। আসল খুনীর সন্ধানে

৫। শান্তিনিকেতনে অশান্তি

৬। হাউসবোটে নিখোঁজ ও অন্যান্য রহস্য

ইত্যাদি

ঢাকা রহস্য উন্মোচিত

সুজন দাশগুপ্ত

এক

কিছুদিন হল একেনবাবু গাছ নিয়ে পড়েছেন। ওঁর মাথায় যখন একবার কিছু চাপে, তখন সেটা সরানো মুশকিল। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে লাগোয়া একটা ছোট্ট বারান্দা আছে। সেখানে দুটো চেয়ার কোনও মতে বসানো যায়। অবশ্য বারান্দায় বসে মনোহর কিছু দেখা যায় না ঠিকই। তবে সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি-টাড়ি প্রচুর চলে। আর যেহেতু আমরা নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির কাছে থাকি। ছাত্রছাত্রীদের ভিড় সবসময়েই লেগে থাকে। কেউ হাঁটে, কেউ জগিং করে। রাস্তার পাশে একটা স্টারবাক কফিশপ আছে - তার সামনের চত্বরে চেয়ার-টেবিল সাজানো। সেখানে দু-একজন বসে থাকে ল্যাপটপ খুলে, বেশির ভাগই হাত-পা ছড়িয়ে কফি, এস্প্রেসো, মোচা লাতে, বেগেল ইত্যাদি খায় আর প্রচণ্ড হৈচৈ করে। আটতলার উপরে বসে সেসব দেখতে মন্দ লাগে না। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। একেনবাবু বারান্দায় গোটা পনেরো ফুল গাছের টব বসিয়েছেন। বই ঘেঁটে ঘেঁটে নানান গাছগুলোর নানান তদারকি চলছে।

বাগান সম্পর্কে আমার চিরদিনের ধারণা মাটি কুপিয়ে বীজ বা চারা লাগানো। মাঝেমধ্যে গোবর সার জাতীয় কিছু দেওয়া। আজকাল আরও হরেক রকমের কেমিক্যাল সার বেরিয়েছে জানি, কিন্তু তা কতটা ব্যবহার করতে হবে, কখন

দিতে হবে, কোনও গাছে দিতে হবে - সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই। কিন্তু একেনবাবুকে বইয়ের পাতা ঘন ঘন উলটে সাদা, খয়েরি, নীল, সবুজ - নানা রঙের দানা মেপে মেপে টবের উপর ফেলতে দেখে মনে হল এর থেকে কেমিস্ট্রির এক্সপেরিমেন্টও সহজ। প্রমথকে একদিন সেটা বলতে ও খ্যাঁক খেঁকিয়ে উঠলো, "রাখ তোর একেনবাবুর বারান্দা-বাগান। এখন পর্যন্ত একটা ফুলও চোখে দেখলাম না, এদিকে বারান্দায় যাবার জো নেই। দেবো একদিন সব কিছু ফেলে।"

একেনবাবুর ডিফেন্স হচ্ছে ফুল ফোটার সময় এখনও আসে নি। আমাদের আরেকটু ধৈর্য ধরতে হবে। তবে উনি যে একটু উদ্বিগ্ন সেটা বুঝলাম। একদিন বলেই ফেললেন, "সূর্যের আলো বেশি আসছে না স্যার বারান্দায়।'

প্রমথ সামনে ছিল। বলল, "তা আপনি কি করতে বলেন, বারান্দাটাকে ঘুরিয়ে পূব মুখো করে দেবো। এদিকে যে আলো বেশি আসে না - সেটাতো দুবছর ধরে দেখছেনই, কি তাহলে বাগানের এক্সপার্ট হলেন!"

"না তা নয় স্যার, ফুল আসবেই। তবে কিনা পুরো পোটেনশিয়ালটা রিয়্যালাইজ হবে না।"

"আর্টিফিশিয়াল লাইট লাগান। তবে ইলেক্ট্রিসিটির বিল আপনি দেবেন, শেয়ার করুন স্যার বলে বায়না ধরবেন না। ইনফ্যাক্ট, বারান্দাটাতো আমরা কেউ ব্যবহার করতে পারছি না, বাপী বরং বারান্দার এরিয়াটা ক্যালকুলেট করে আপনার ভাড়ার শেয়ারটা বাড়িয়ে দিক।"

প্রমথ সত্যিই একেনবাবুর পেছনে লাগতে পারে!

“কিযে বলেন স্যার, এই ফুলগুলো যখন ফুটতে শুরু করবে, কি রকম শোভা হবে বলুনতো? আমি জানি ম্যাডাম ফ্র্যান্সিস্কা ফুল ভালোবাসেন।’

ফ্র্যান্সিস্কা প্রমথর গার্লফ্রেণ্ড, যদিও প্রমথ গার্লফ্রেণ্ড কথাটা শুনলে তেলে-বেগুন হয়ে যায়। জাস্ট ফ্রেণ্ড - আগে আবার বিশেষণ যোগ করতে হবে কেন?

যাক গে ওসব কথা। একেনবাবুর এই গার্ডেন প্রজেক্ট যে পর্বতের মূষিক প্রসব সেটা আমরা দুজনেই আঁচ করছি। মনে মনে ভাবি ভাগ্যিস দেশের চাষিভাইরা বেশি পড়া-লেখা করেন না, নইলে বাজারে চাল-ডাল-সবজি পাওয়া যেত না।

আজ সকালে একেনবাবু আর প্রমথ দুজনেই বেরিয়েছে। একেনবাবুকে গাছের জন্য একটা ওষুধ কিনতে হবে। একটা গাছের পাতায় লিফ মাইনর না কি একটা অসুখ হয়েছে। ভদ্রলোক সত্যিই ক্ষেপে গেছেন। এমনিতে হাড়-কিপ্পন, কিন্তু গাছের পেছনে যা খর্চা করেছেন, তা দিয়ে উনি স্বচ্ছন্দে ওঁর পুরনো অল-ওয়েদার কোটটি বিসর্জন দিয়ে একটা নতুন কোট কিনতে পারতেন। কি আর করা ! তবে ওরা যাওয়াতে আমার সুবিধা হয়েছে। আজকে খুব রিল্যাক্স করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবো আর নিউ-ইয়র্ক টাইমস পড়ব। গত দু-সপ্তাহ ধরে খাতা দেখা আর একটা রিসার্চ পেপার লেখার চাপে

গা ছেড়ে জীবনটা উপভোগ করা হয় নি। কিন্তু সেটা হবার কি জো আছে! ডিং ডং বেল। দরজা খুলে দেখি তারেক আলী।

“বুঝলেন বাপীদাদা, বাংলাভাষা আর সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে আমাদের বাংলাদেশ, আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ নয়।”

কি খবর, কেমন আছেন দূরে থাক, হ্যালো পর্যন্ত নয়। প্রথমেই একটা যুদ্ধং দেহি ভাব!

চট করে তারেকের পরিচয়টা দিয়ে নিই। তারেক ক'মাস হল আমাদের পাশের অ্যাপার্টমেণ্টটা ভাড়া নিয়েছে। কোন একটা আই.টি ফার্মে কাজ করে। বাড়ি ঢাকাতে। কয়েক মাস হল এইচ-১ ভিসা নিয়ে আমেরিকায় এসেছে। শুধু তারেক নয়, ওর সঙ্গে মামুদ বলে আরও একটি ছেলে এসেছে - একই কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে। কিন্তু মামুদ একটু মুখচোরা, বিশেষ আসে না। তারেকভায়া একাই একশো। একেনবাবুর সঙ্গে পাল্লা দেবার উপযুক্ত লোক। মাঝে মাঝে যখন তারেক আর একেনবাবুর বকবকানির সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু হয়, তখন আমি কাজ আছে বলে অফিসে পালাই। তবে মাঝেমধ্যে তারেকের কথাগুলো মন্দ লাগে না। ছেলেটার মধ্যে একটা চাপা হিউমার আছে। সেই হিউমারটা পরিপূর্ণ রূপ পায় ওর বাঙ্গাল কথার টানে। সেই কথা আর সুরকে অক্ষরে তুলে ধরার ক্ষমতা আমার নেই। বাঙ্গাল পাঠকদের কাছে তাই আগেভাগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

একদিন হঠাৎ তারেক বলল, “বুঝলেন দাদা, বাংলাদেশের মতো প্রোগ্রেসিভ দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।”

প্রমথ সকালে সবার জন্য ডিমের অমলেট করছিল। রান্নাঘর থেকেই তারেকের কথা শুনে চেঁচিয়ে বলল, “হোয়াট ননসেন্স!”

“ননসেন্স কেন দাদা, ভুলতো কিছু আমি বলছি না।”

আমিও বললাম, “কি প্রোগ্রেস এতো দেখলে শুনি?”

“আচ্ছা শোনেন। আমাদের প্রথম প্রেসিডেন্টকে আমরা সবংশে নিধন করেছি, দ্বিতীয় প্রেসিডেন্টকে শুধু একা মেরেছি। তৃতীয় প্রেসিডেন্টকে মারি নি, শুধু জেলে পুরেছি - প্রগ্রেসটা একবার দ্যাখেন?”

প্রমথ যে প্রমথ সেও বলে উঠলো, “নাহে, এবার তোমার কথাটা মানছি।”

তারেক আসা মানে নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়া আজ মাথায় উঠলো। অন্তত: ঘণ্টা খানেক বক্তৃতা করবেই। কিন্তু বাংলাদেশের ছেলে - দুই বাংলার মিলন ঘটাতে এসেছে তাকে তো তাড়ানো যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম, “কফি খাবে?”

“না দাদা ”, তারেক বলল, “উত্তরটা কিন্তু দিলেন না, কথাটা আপনি মানেন?”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কোন কথাটা?”

“এই যে বাংলা ভাষা আর সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার কথা।’

“তোমার এই কথা বলার বেসিস কি?”

“আপনারা।”

“আমরা ! হোয়াই?”

“এই যে দাদা, আপনারা কথায় কথায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন। ‘যুক্তি’ অথবা ‘কেন’ না বলে বললেন ‘বেসিস’ আর ‘হোয়াই’। বাংলা যখন বলবেন, তখন শুধু বাংলা বলবেন, ইংরেজি যখন শুধু ইংরেজি।”

কথাটা তারেক ভুল বলে নি। আমার অর্ধেক কথাতেই ইংরেজি শব্দ এসে যায়। ফ্র্যাঙ্কলি অনেক কথা বাংলাতে কি হবে সেটাই মাথায় আসে না। কিন্তু সাত সকালে তারেকের এই বক্তব্য আমি মানতে রাজি নই। ভাষা নিয়ে যুদ্ধ করেছিস - বেশ করেছিস, কিন্তু তা বলে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাকে বাংলাদেশী বাংলা হারিয়ে দেবে - এ আবার কি আবদার ! বিশেষ করে যারা জলকে পাণি বলে, আর স্নানকে গোসল - তারা বাংলা নিয়ে মাতব্বরি করবে কেন? কিন্তু ওটা একটু ডেলিকেট সাবজেক্ট। তাই বললাম, “দ্যাট্স লাইফ। ভাষাতো

চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকে না। প্রয়োজনে বদলায়। ইংরেজিতেওতো অনেক অন্যান্য ভাষা এসেছে।"

"কিন্তু তা বলে দাদা হোয়াই-কে বাংলায় নিয়ে আসবেন– 'কি'-টা কি দোষ করল?"

"তোমরাওতো বাপু দিদিকে আপা বল, পিসি না মাসিকে বুয়া।"

"আপনি দাদা রেগে তক্ক করছেন। সত্যি ভেবে দেখুন, গান বলুন , নাটক বলুন, সিনেমা বলুন - বাংলাদেশের সঙ্গে কি আপনারা পেরে উঠছেন?"

"গানে তোমরা এগিয়ে আছো?"

"আছি দাদা। বার করুন একজন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা।'

"স্যাম্পল অফ ওয়ান দিয়ে তুমি তোমার থিওরি প্রুভ করতে চাও?"

"তা নয় দাদা, আপনারাতো আমাদের অন্য আর্টিস্টদের গান শোনেন না, বন্যাই এখানে আসেন - সেটাই শোনেন। তারপর দেখুন, নাটক বা টেলি ফিল্ম - অপি করিমের মতো বুদ্ধিদীপ্ত নায়িকা আপনাদের টিভিতে কেউ আছে? তিশা, মৌসুমি বা বিপাশা হায়াতের মতো সুন্দরী?"

"যাদের কথা বলছো, তাদের কাউকেই দেখি নি।"

"তাহলে বলি দেখুন দাদা, দেখলে আপনার চোখ জুড়বে, আর আমার সঙ্গে তর্ক করবেন না।"

“তুমি পশ্চিমবঙ্গের সব অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদের দেখেছো?”

“আলবৎ দাদা, নইলে তুলনামূলক বিচার করবো কি করে? পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের লেখা আমরা পড়ি, সিনেমা দেখি, সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকাগুলো পড়ি। সেগুলোওতো সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার একটা অঙ্গ। এবার আপনি বলুন, বাংলাদেশের কি কি বই আপনি পড়েছেন?”

“দেখো বাপু, আমি ফিজিক্সের বই শেষ করারই সময় পাই না। বাংলা সাহিত্যতো দূরের কথা।”

“তাইতো বলছি দাদা, বাংলাকে বাংলাদেশই বাঁচিয়ে রাখবে।”

লাকিলি এই সময়ে একেনবাবু ঢুকলেন। “এই যে, স্যার, কি মনে করে?”

“এই দাদার সঙ্গে একটু গল্প করতে এসেছিলাম।”

“বাপু সত্যি কথাটাই বল না - তর্ক জুড়তে এসেছ।”

“কিযে বলেন দাদা, তর্ক নয়, একটু আলোচনা।”

“কি নিয়ে আলোচনা স্যার, বলুন একটু শুনি?”

“আমি বলছিলাম বাংলা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে বাংলাদেশ - পশ্চিমবঙ্গ নয়। কিন্তু দাদা মানতে রাজি নন।”

“কেন স্যার ?”

“আপনি তারেকের পক্ষ নিচ্ছেন?”

“পক্ষ নিচ্ছি না স্যার, আপনার পজিশনটা বুঝতে চাচ্ছি।’

“আমার কোনো পজিশনই নেই - এইসবে সময় নষ্ট করা।’

“এইটে দাদা ঠিক বলেছেন। আপনারা যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী - তাঁরা বাংলা নিয়ে সময়ে নষ্ট করছেন না বলেই বাংলাভাষা পশ্চিমবঙ্গে ধ্বংস হবে।”

“চুকে যাবে, এখনতো ইংরেজি আর হিন্দিরই যুগ।”

“তা হোক দাদা, কিন্তু একেনবাবুর যে কাহিনীগুলো লিখছেন - সেগুলোওতো কেউ পড়বে না।”

“এখনও কেউ পড়ে নাকি ?” প্রমথ কখন ঘরে ঢুকেছে আমি টেরও পাই নি। “লোকে না জানে একেনবাবুকে, না জানে বাপীকে।”

“কেন দাদা, আমিতো পড়েছি।”

প্রমথ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ওস্তাদ। বলল, “তাই নাকি? কোত্থেকে?”

“ঐ যে আপনাদের একটা পত্রিকা বেরোয় সুখী গৃহকোণ - সেইখানে?”

“কোথায়, বাংলাদেশে যখন ছিলে?”

“না না, বাপী দাদা পড়তে দিয়েছিলেন।”

“তাহলে মোট দুজন পড়েছো - বাপী নিজে আর তুমি। কারণ আমি পড়ি নি, একেনবাবুও না।”

“কিযে বলেন প্রমথদা, মামুদও পড়েছে।”

“তাহলে তিনজন। তবে জিজ্ঞেস করে দেখো - পুরোটা পড়েছে কিনা। কারণ বাপীর লেখাটা কয়েক পাতা পরেই ঝুলে যায়।”

“তুই থামবি ”, আমি বিরক্ত হয়ে বললাম।

একেনবাবু আমার পক্ষ নিয়ে বললেন, “কিযে বলেন স্যার, সুখী গৃহকোণতো এখন অনেক সেল হয়।”

“সে নিয়ে তো আমি প্রশ্ন তুলছি না। ডিকশনারিতো প্রচুর বিক্রি হয় আপনিওতো কিনেছেন একটা। কোনোদিন ব্যবহার করেছেন?”

প্রমথর পাঞ্চগুলো একেবারে র্যা গ্যাম। সত্যি কোনো বানান জানতে হলে একেনবাবু প্রমথকেই জিজ্ঞেস করেন। না থাকলে আমাকে। ডিকশনারিটা বহুদিন ধরেই তাকের উপর অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে।

“বই কিনলেই যদি পড়া হয়ে যেতো, তাহলে এতগুলো ছাত্রছাত্রী প্রতি বছর ফেল করতো না।”

এই রকম অদ্ভুত যুক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন। তারওপর প্রসঙ্গটা যখন আমার লেখা নিয়ে আমি এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করলাম না।

তবে প্রসঙ্গটা তারেকই পাল্টালো। বলল, "আসলে আমি এসেছিলাম একেনবাবুর কাছে।"

"আমার কাছে স্যার ! কি ব্যাপার ?"

"মামুদকে নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে।"

"কি সমস্যা?"

"বলছি।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদা, তাহলে ঐ কফিটা বানান, খেতে খেতে বলি।"

কফি খেতে খেতে তারেক যা বলল সেটা হল মামুদ কয়েকদিন হল খুব ডিপ্রেসড হয়ে আছে। মামুদ এমনিতে কথাবার্তা কমই বলে। তবে এ কদিন দুয়েকটা হাঁ হুঁ ছাড়া আর কিছুই বলে নি। শেষে তারেকের পেড়াপেড়িতে ও জানিয়েছে দেশ থেকে একটা চিঠি পেয়ে ওর সন্দেহ হচ্ছে যে পাঁচ মাস আগে ওর বাবার মৃত্যুটার মধ্যে হয়তো কোনও রহস্য আছে - ওটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। তারেক যখন জিজ্ঞেস করেছে - কার চিঠি? মামুদ উত্তর দিয়েছে,

চিঠিটা ওর বাবারই লেখা। এসেছে বাবার অ্যাটর্নির কাছ থেকে। যাইহোক, তারেক আর বিশেষ কিছু জানতে চায় নি। কিন্তু মামুদকে বলেছে যে ও একবার একেনবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখুক। তিনি হয়তো এ বিষয়ে একটা মতামত দিতে পারবেন। মামুদ প্রথমে উৎসাহ দেখায় নি - বোধহয় ওর সমস্যা নিয়ে আর কাউকে বিব্রত করতে চায় নি। কিন্তু পরে রাজি হয়েছে। কিন্তু নিজে এ নিয়ে অনুরোধ করতে অসোয়াস্তি বোধ করছে, তাই তারেক এসেছে একেনবাবু মামুদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হবেন কিনা জানতে।

একেনবাবু সব শুনে বললেন, "কি আশ্চর্য স্যার, এটা কি কোনও কথার কথা!"

দুই

খানিক বাদে তারেক মামুদকে নিয়ে এলো। তারেক ভুল বলে নি। মামুদের চেহারা দেখে বোঝা যায়, ওর মনের ওপর একটা ঝড় চলছে। ঘরে প্রায় নিঃশব্দে ঢুকে সোফার একটা কোনে চুপ করে বসল। এমনিতেই যতবার ও এসেছে দুয়েকটার বেশি কথা বলে নি। ওকে কথা বলানো মানে, প্রশ্ন করা আর তার উত্তরে হ্যাঁ বা না শোনা। আজ যদিও নিজের তাগিদেই এসেছ কথা বলার জন্য। কিন্তু স্বভাবোচিত সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না। এমনিতে ও ব্যাপারটা কতটা বলতে পারবে আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু তারেক এবং একেনবাবু যখন আছেন, তখন প্রশ্নের কিছু কমতি হবে না। সুতরাং তথ্য উদ্ঘাটন চট করে না হলেও, সেটা যে হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আমরা সবাই চুপ করে আছি। নিস্তব্ধতাটা একেনবাবুই ভাঙলেন। একেনবাবু বললেন, "বলুন স্যার, তারেক সাহেব বললেন আপনি আমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।"

"আমি একটু চিন্তায় পড়েছি ", মামুদ আস্তে আস্তে বললেন।

"কিসের চিন্তা স্যার ?"

“হয়তো অহেতুক চিন্তা, কিন্তু মাথা থেকে সরাতে পারছি না। আপনাকে বলতে চাই, আবার মনে হচ্ছে - চিন্তাটা এতই অর্থহীন যে এ নিয়ে অন্যদের বিব্রত করাটাও বোধহয় অনুচিত।”

“স্যার আপনি এতো ভাবনা করছেন কেন, বলে ফেলুন। বন্ধুদের কাছে বলবেন স্যার - এ নিয়ে এতো সঙ্কোচ কেন?”

“সঙ্কোচ ঠিক নয়, আসলে ব্যাপারটা হয়তো কিছুই নয়। “

“বলে ফেলুন স্যার। তারেক সাহেব বলছিলেন একটা চিঠির কথা - তাতে নাকি কিছু একটা খবর আছে।”

“চিঠির কথাটা ঠিকই বলেছে তারেক। আমার বাবা একটা চিঠি আনোয়ারচাচা, মানে বাবার অ্যাটর্নীর কাছে রেখে যান - বাবার মৃত্যুর পর আমাকে দেবার জন্য। চিঠিতে বাবা লিখেছেন যে, উনি আশঙ্কা করছেন যে, ওঁর হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে। এই কথাটাই আমাকে প্রচণ্ড ভাবে বিচলিত করেছে। কেন কথাটা উনি লিখলেন?”

“এই চিঠির ব্যাপারে আপনি আগে কিছু জানতেন না স্যার?”

“না, বাবা আমায় কিছু বলে যান নি।”

“আপনার বাবার কতদিন আগে মারা গেছেন?”

“আমি এদেশে আসার মাস দুয়েক আগে - তা প্রায় প্রায় মাস পাঁচেক হল।”

“আপনার আনোয়ারচাচা এতদিন চিঠিটা দেন নি কেন স্যার?”

“আনোয়ারচাচা নিজে বেশ কয়েকমাস মরণাপন্ন অসুস্থ ছিলেন। কিছুদিন হল আবার কাজকর্ম শুরু করেছেন। উনি লিখেছেন চিঠিটার কথা উনি ভুলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওর নজরে এসেছে।’

“আই সি। তা আপনি এতো বিচলিত হচ্ছেন কেন স্যার, ওঁর মৃত্যুটা কি অস্বাভাবিক ভাবে হয়েছিল?”

“সেটা নিয়েই ভাবছি। বাবা মারা যান একটা পার্টি চলাকালীন। হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে ওঁর মৃত্যু হয়।”

“আপনার বাবার হার্টের কোনও প্রব্লেম ছিল?”

“তা ছিল, বাবার হার্ট বরাবরই খারাপ। বছর তিনেক আগে ওঁর ট্রিপ্‌ল বাইপাস হয় আপনাদের মুম্বাইয়ের এক হাসপাতালে। কিন্তু তারপর থেকে উনি ভালোই ছিলেন। খুব সাবধানে নিয়ম মতোই চলতেন। তবে নিয়ম মেনে চললেও প্রব্লেমতো হতেই পারে।”

“তাহলে আপনার সন্দেহ জাগছে কেন স্যার?”

“তাইতো বলছি যে, চিন্তাটা মনে হয় অহেতুকই। তাছাড়া পার্টিতে আমার খালু ছিলেন, যিনি পুলিশের সাবেক ডিআইজি।”

“সাব-ডি.আই.জি-টা কি?” প্রমথর প্রশ্ন।

“‘সাব’ নয় দাদা, ‘সাবেক’ - মানে প্রাক্তন ”, তারেক বিশদ করল।

“আর খালু?” একেনবাবু প্রশ্ন করলেন।

“মেসোমশাই।”

“সরি স্যার, বলুন।”

“তিনি অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু দেখেন নি। তাছাড়া বাবার কাছের মানুষ আরও অনেকে ছিলেন। তাঁদেরও কেউ কোনো রহস্য এর মধ্যে দেখেন নি, নইলে কানাঘুষো শুনতাম। বাবার পানীয়টাও পুলিশ পরীক্ষা করেছিল - কিছু পায় নি।”

“দাঁড়ান স্যার, দাঁড়ান। পুলিশ কেন এসেছিল?”

“এর উত্তর আমি ঠিক বলতে পারবো না। ডাক্তার আহমেদ আমাদের পাড়াতেই থাকেন। তিনি বাবাকে নিয়মিত না হলেও মাঝে মধ্যে দেখতেন। তিনিও পার্টিতে ছিলেন। এবং বাবাকে পরীক্ষা করে ডেথ সার্টিফিকেটও দিয়েছিলেন। আমার ধারণা খালু তাও হয়তো একটু নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন।”

“তা পানীয়তে যখন কিছু পাওয়া যায় নি, তাহলে এখন ও নিয়ে চিন্তা হচ্ছে কেন স্যার?”

“কে জানে, আমি হয়তো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবো না। কতগুলো জিনিস এখন মনে হচ্ছে ঠিক ছিল না।”

“যেমন ?”

“যেমন, পার্টি চলার সময়ে দুবার টেনিস কোর্টের বাতিগুলো নিভে যায়। দুবারই সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করেছিল। আমাকে গিয়ে রিসেট করতে হয়েছিল। তখন এ নিয়ে আমি অতটা ভাবি নি। অনেক সময়ে লাইনের ওভারলোড যদি খুব কম থাকে, তাহলে সার্কিট ব্রেকার সব সময়ে ট্রিপ নাও করতে পারে।”

“আমি একটু কনফিউসড স্যার টেনিস কোর্টের সঙ্গে পার্টির সম্পর্কটা কি?”

“ও সরি, পার্টিটা টেনিস কোর্টেই হচ্ছিল। আসলে বাবার হার্ট বাইপাসের পরে টেনিস কোর্ট আর ব্যবহার করা হত না। আমি নিজে কোনোদিনই টেনিসে উৎসাহী ছিলাম না। তাই ওটা এমনিই পড়ে থাকতো। শুধু পার্টির সময়ে ব্যবহার করা হত। শেষ পার্টিটা ঐ টেনিস কোর্টেই হয়েছিল।’

“এবার বুঝলাম। বলুন স্যার কি বলছিলেন।”

“কি বলছিলাম আমি?”

“বলছিলেন স্যার, সার্কিট ব্রেকার মাঝে মাঝে এমনিতে ট্রিপ করতে পারে - সে নিয়ে তখন কিছু ভাবে নি।”

“ও হ্যাঁ। কিন্তু এখন ভাবছি, দ্বিতীয়বারের পরে আর ব্রেকার ট্রিপ করে নি কেন! আমি তখন ভেবেছিলাম বাড়ির পেছনে সুইমিংপুল আর বাগানের স্পট্ লাইটগুলো নিভিয়ে দিয়েছিলাম বলে বোধহয় লোড কমে গিয়েছিল। কিন্তু এখন মনে পড়েছে যে ঐ আলোগুলো ছিল অন্য সার্কিটে - তাদের ব্রেকার আলাদা। ওগুলোর জ্বলা নেভার সঙ্গে টেনিস কোর্টের আলোর কোনও সম্পর্ক নেই।”

“আই সি।”

“এছাড়া বাবা নাকি অরেঞ্জ জুসের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলেছিলেন, জুসটা তিতো। আমিও অরেঞ্জ জুসই খাচ্ছিলাম, আমার তিতো লাগে নি।”

“কিন্তু সেই জুসটাতো পরীক্ষা করা হয়েছিল?”

“তা হয়েছিল। সেইজন্যেই মনে হচ্ছে - সবকিছুই হয়তো অহেতুক চিন্তা।’

“চিন্তা যখন আপনার হচ্ছে, তখন একটা কাজ করা যাক স্যার। আপনি পার্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে বা দেখেছেন সবকিছু ডিটেল্‌সে বলুন। কিচ্ছু বাদ দেবেন না।”

“কিরকম ডিটেল্‌স?”

“এই যেমন স্যার, পার্টি কখন শুরু হল, কারা এসেছিলেন, বসার কি বন্দোবস্ত ছিল, খাবার কোত্থেকে এসেছিল, কে কোথায় বসেছিলেন, কখন আলো নিভলো - যা-যা আপনার মনে আছে - সব।’

“কি ভাবে শুরু করি ”, বলে মামুদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর আস্তে বলা আরম্ভ করল:

“আমার বাবা মাঝে মাঝেই বাড়িতে পার্টি দিতে ভালো বাসতেন। আবহাওয়া ভালো থাকলে পার্টিটা বাইরে হত, নইলে বাড়ির হলঘরে। আমাদের বাড়িটা বেশ বড়। বাবা প্রচুর টাকা খরচ করে এটা বানিয়েছিলেন বছর দশেক আগে। আমাদের বাড়ির সামনে ছিল একটা বড় টেনিস কোর্ট আর তার চারিধারে ঘিরে ছিল বিশাল বাগান। পেছনে সুইমিং পুল আর তার চারপাশে কিছুটা বাঁধানো চত্বর, তারপর আবার বাগান।। পার্টি শুরু হয়েছিল সন্ধ্যার সময়ে। প্রায় একশোর মতো লোক পার্টিতে নিমন্ত্রিত ছিলেন। বাবার বিজনেসের সূত্রে চেনাজানা, রাজনৈতিক জগতের লোক, সরকারী অফিসার, লেখক, শিল্পী, চিত্রতারকা - মোটমাট বাংলাদেশের বেশ কিছু নামীদামী লোককে বাবা ডেকেছিলেন।

পার্টি শুরু হয়েছিল সাড়ে সাতটা নাগাদ। ড্রিঙ্ক আর অ্যাপেটাইজার দেওয়া হয়েছে। যাঁরা মদ খান তাঁদের জন্য ওয়াইন, বিয়ার, হুইস্কি, জিন, শেরি ইত্যাদি হরেক রকম পানীয় রয়েছে। আর অন্যদের জন্য অরেঞ্জ জুস, পাইনাপেল জুস, কোক - ইত্যাদি। বাবা অসুস্থ হবার পর থেকে পার্টি-টার্টির সব দায়িত্ব পড়েছিল বাবার বিজনেস পার্টনার জামালচাচার উপরে।

জামালচাচা বাবার থেকে বয়সে অনেক ছোট - বাবাকে বড় ভাইয়ের মতোই দেখতেন; বাবার অনেক ব্যক্তিগত কাজেও সাহায্য করতেন। ঢাকার এক কেটারারকে দিয়ে জামালচাচা সব কিছু করাতেন। টেবিল চেয়ার আনা থেকে শুরু করে - সেগুলো সাজানো, মিনি-বার বসানো, অন্যান্য ডেকোরেশন, পানীয়, অ্যাপেটাইজার ও খাবার ইত্যাদির আয়োজন ও পরিবেশন - সবকিছুই তারা নিখুঁত ভাবে করত। বাবা অসুস্থ হবার পর অন্তত: গোটা ছয়েক পার্টি এই কেটারার আমাদের বাড়িতে করেছে। খুব বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সবকিছুই চমৎকার চলছিল। ঠিক পৌনে আটটা যখন বাজে তখন হঠাৎ টেনিস কোর্টের আলো সব নিভে যায়।

মাপ করবেন স্যার, ঠিক পৌনে আটটা সেটা আপনি কি করে বুঝলেন?

ওটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। আমি একটা সস্তা ডিজিট্যাল হাতঘড়ি কিনেছিলাম তার কয়েকদিন আগে। কোনও কারণে সেটাতে রাত্রি পৌনে ৮-টার অ্যালার্ম দেওয়া ছিল। আমি কিছুতেই অ্যালার্মটাকে ক্যানসেল করতে পারছিলাম না। প্রতিদিন রাত্রি পৌনেআটটায় ওটা বাজতো, একটা বোতাম টিপে আমি আওয়াজটা বন্ধ করতাম। আলোটা পৌনে আটটাতেই নিভেছিল, কারণ ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই আমার ঘড়ির অ্যালার্মটা বেজে উঠেছিল।

ঢাকাতে মাঝেমধ্যে বাতি চলে যায়। আমাদের একটা জেনারেটর ছিল। বাতি নিভলে সেটা চালানো হত। কিন্তু আমি দেখলাম রাস্তার আলো নেভে নি। আমাদের বাড়ির ভেতরের আলোগুলোও জ্বলছে। সুতরাং সার্কিট ব্রেকার কোনও কারণে ট্রিপ করেছে। বাবা চেয়ারে বসেছিলেন। আমি বাবার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাবাও ব্যাপারটা বুঝেছেন। বললেন, বাড়ির ব্রেকারগুলো গিয়ে দেখতে। আম্মা বাবার পাশে বসে ছিলেন। আম্মা বললেন, 'আমাকেও ঘরে যেতে হবে, তোমার বাবার ওষুধ আনতে ভুলে গেছি।'

আমি বললাম, 'কোথায় ওষুধটা আছে বল, আমি নিয়ে আসছি।'

আম্মা বললেন, 'না, তুমি খুঁজে পাবে না। আমাকে নিয়ে চলো।'

অন্ধকারে আম্মাকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছতে আমার একটু সময়েই লেগে গেল।

বাড়িতে ঢুকে আম্মা লিফটে উঠলেন, আর আমি ..... ।"

"লিফট?"

"বাবার অসুখের পর ওটা লাগানো হয়।"

"আই সি, সেটা কোথায়?"

"দরজা খুলে ঢুকেই হলের ডানপাশে।"

"বুঝলাম স্যার, ঠিক আছে বলুন।"

“সার্কিট ব্রেকারগুলো হল ঘরের অন্যপ্রান্তে সিঁড়ি ঘরের দেয়ালে। আমি যখন সেদিকে এগোচ্ছি, তখন দেখলাম জামালচাচা বাথরুম থেকে বেরোচ্ছেন।”

“বাথরুমটা কোথায় স্যার ?”

“লিফটের পাশে উপরে যাবার আরেকটা সিঁড়ি, তার ঠিক পরেই।”

“তারপর কি হল স্যার ?”

“ও হ্যাঁ, জামলচাচা আমাকে দেখে বললেন, ‘কি ব্যাপার ?’

আমি বললাম, ‘বাতি নিভে গেছে।’

‘সেকি!’

‘হয়তো ওভারলোড, ব্রেকার ট্রিপ করেছে।’

‘আচ্ছা বিপদতো! কিন্তু অন্ধকারে মাসুদভাইকে একা রেখে চলে এলে.... আম্মা আছে তো?’

আম্মা ওষুধ আনতে উপরে গেছে শুনে জামালচাচা তাড়াতাড়ি ছুটলেন। বাবার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জামলচাচার একটা দুশ্চিন্তা আছে। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বাবা যাতে বেহিসাবি কিছু না করেন সেই জন্য পার্টি-টার্টিতে উনি বাবাকে খুব নজরে রাখেন। আমার অবশ্য এটা বাড়াবাড়ি লাগে, কারণ বাবাকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন বলেই আমার মনে হয়।”

“একটা প্রশ্ন স্যার। আপনাদের বাড়ির সেট-আপটা একটু বলুন। আপনি টেনিস কোর্ট থেকে বাড়িতে ঢুকলেন কি ভাবে?”

“টেনিস কোর্টের পাশেই গাড়ি-বারান্দা। সেখান থেকে সামনে বাড়ির একটা ছোট্ট বারান্দা পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হয়। সেট আপটা মুখে কতটা বোঝাতে পারবো জানি না। কিন্তু আমার কাছে অনেক ছবি আছে সেগুলো দেখালে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।”

“ঠিক আছে স্যার, সেটা পরেই না হয় দেখাবেন। এবার বলুন তারপর কি হল।”

“হলের অন্যপ্রান্তে পৌঁছে ব্রেকারবক্সটা খুলে দেখি, সত্যিই একটা ব্রেকার ট্রিপ করেছে। ওটা সেট করে দিতেই একটা হাততালির আওয়াজ ভেসে এলো। অর্থাৎ টেনিস কোর্টে আবার বাতি ফিরে এসেছে।” এতটা বলে মামুদ একটু লজ্জিত ভাবে বললেন, “আচ্ছা, আমি কি বেশি ডিটেলে আপনাকে বলছি?”

“এতটুকু নয় স্যার। ঠিক এভাবে বলে যান - যা যা ঘটেছিল। তবে একটা প্রশ্ন স্যার, সার্কিট ব্রেকার বক্সের কাছাকাছি আর কাউকে দেখলেন?”

“হ্যাঁ, আমাদের মালীর আয়েষা নামে একটি বোবা মেয়ে আছে। বছর দশ এগারো বয়স। সে ওখানে ঘুরঘুর করছিল। ও বুদ্ধিতেও খাটো - এদিক ওদিক নিজের মনেই ঘুরে বেড়ায়। আমার একবার মনে হয়েছিল, মেয়েটাই ব্রেকারে হাত দিয়েছে কিনা। আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু খেয়াল

হল ও জবাব দিতে পারবে না। তবে ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম, এখানে হাত দিবি না বলে।"

"ও কথা বুঝতে পারে ?"

"তা মোটামুটি পারে।"

"আর কাউকে দেখেন নি স্যার ?"

"না।"

"সিঁড়িঘরের সিঁড়িটাও কি দোতালায় যাবার ?"

"হ্যাঁ, দোতালায় যাবার দুটো সিঁড়ি। এই সিঁড়িটা কাজের লোকরাই সাধারণত: ব্যবহার করে। এক-আধ সময়ে আমরাও করি, যখন বাড়ির পাশে ফলের বাগানে যাই।"

"তারপর বলুন স্যার।"

"আমি যখন বাইরে এলাম তখন দেখি জামালচাচা বাবার স্বাস্থ্যকামনা করে একটা টোস্ট দিচ্ছেন। অনেকে ওখানে মদ খেলেও বাবা হার্ট বাইপাস হবার পর থেকে আর মদ খান না। পার্টি-টার্টিতে সাধারণতঃ কমলালেবুর রস বা আনারসের রস - এইরকম কিছু খান। জামালচচার পর খালুও টোস্ট

দিলেন। তখনই বাবার মুখ দেখে মনে হল বাবার মুখটা একটু বিকৃত। বাবা বললেন, 'জামাল, বেশ তিতো এবারের জুসটা।'

জামলচাচা বললেন, 'সেকি, আমারতো সেরকম লাগছে না।' বলতে বলতেই আবার আলো নিভে গেল। আমি আবার ছুটলাম সার্কিট ব্রেকার অন করতে।

কে জানি পেছন থেকে বললেন, পেছনের বাগানের আলোগুলো বন্ধ করে দিতে , তাহলে লোডটা একটু কমবে। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে সার্কিট ব্রেকারটা অন করে, পেছনের আলোর মেইন সুইচটা অফ করে দিয়ে যখন ফিরলাম তখন বাবাকে ডাক্তার আহমেদ আর খালু ধরাধরি করে শুইয়ে দিচ্ছেন মাটিতে। আমি জামলচাচাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে?'

জামলচাচা একেবারে হতচকিত। বললেন, 'কি জানি, হঠাৎ খেঁচুনি দিয়ে পড়ে গেলেন।'

তাহলে কি স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক - কি হল বাবার ! কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখলাম বাবার দেহটা একেবারে নিথর।

পার্টিতে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সবাই দিশেহারা। ডাক্তার আহমেদ গলার পাশে আঙুল দিয়ে মাথা নাড়লেন। ইতিমধ্যে খালু পুলিশে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলেছে। আম্মা বাবাকে জড়িয়ে ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করেছেন। কয়েকজন মহিলা আর মিসেস আহমেদ আম্মাকে ধরে আছেন। আমার বুকে যে কী কষ্ট হচ্ছে বোঝাতে পারবো না। আমি নীচু হয়ে বসে বাবার গায়ে

হাত দিয়ে দেখলাম শরীরটা যেন ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। আমার পাশে ডাক্তার আহমেদ। আমি তখন একটাই প্রশ্ন, 'সব শেষ?'

উনি মাথা নাড়লেন।

জামালচাচা শুনলাম খালাকে বলছেন, 'মাসুদভাই জুসটা খেয়ে তিতো বলেছিলেন। আমারতো তিতো লাগলো না। বুঝতে পারছি না।

খালু সেটা শুনেই একটা রুমাল দিয়ে বাবার গেলাসটা ঢেকে রাখলেন।

খানিক বাদেই অ্যাম্বুলেন্স এলো, সেইসঙ্গে পুলিশও। খালু পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কিসব বললেন। তারপর তাঁরা বাবার পানীয়ভর্তি গ্লাসটা নিয়ে চলে গেলেন।

আমি এতো শোকাচ্ছন্ন যে, কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। কিন্তু আমার আশেপাশে যা হচ্ছে সবই কানে আসছে। ডাক্তার আহমেদের সঙ্গে খালু আর জামালচাচার কথাবার্তা শুনছিলাম, অন্যদিকে আম্মার বিলাপ। অনেকে এসে আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। এরই ফাঁকেই আমি শুনলাম ডাক্তার আহমেদ জামালচাচাকে বোঝাচ্ছেন যে, তিতো লাগাটা কিছু অস্বাভাবিক নয় - ওটা স্ট্রোকের আগে সাময়িক বিভ্রান্তি। সিজার হওয়ার আগে অনেক রকম অদ্ভুত স্বাদ গন্ধ মানুষ পায়।

জামলচাচা বললেন, 'কিন্তু স্ট্রোকতো পরে হল !'

‘আমার মনে হয় ম্যাসিভ স্ট্রোকের একটু আগেই একটা মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছিল। তখনই উনি জুসটা তিতো লাগার কথা বলেছিলেন। ওঁর হার্টটাও খুব বাজে অবস্থায় ছিল।’

কে জানি ডাক্তার আহমেদের কথা সমর্থন করলেন। ‘হ্যাঁ, প্রথমেতো দু-এক চুমুক জুস খেলেন, তখন তো তিতো বলেন নি।’

‘কে জানে, আমারতো ওঁকে অসুস্থ বলে মনে হত না।’ জামালচাচা যেন আত্মগত হয়েই বললেন।

আমারও সেটাই ধারণা ছিল। বাবা এতো সংযত হয়ে থাকতেন যে, হঠাৎ এভাবে চলে যাবে, এটা কখনোই আমার মনে হয় নি।

পরের প্রশ্নটা হল বাবার পোস্ট মর্টেম হবে কিনা। আম্মার ভীষণ আপত্তি বাবার শরীর কাটা ছেঁড়া হবার ব্যাপারে। ডাক্তার আহমেদও সেটা করার খুব একটা কারণ দেখছেন না। যদি পানীয়তে গোলমেলে কিছু পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্য অন্যকথা। সুতরাং দ্রুত পানীয়টা পরীক্ষাটা করা হোক। সেখানে কিছু না পাওয়া গেলে, ধর্মাচারে যা যা পালনীয় সেটা করা হবে। খালু আর জামালচাচা তার দায়িত্ব নিলেন - আমি শুধু সঙ্গে থাকবো।

পরদিন সকালেই জানা গেল পানীয়তে কিছু পাওয়া যায় নি। সুতরাং পোস্ট মর্টেম করার আর কোনও কারণ রইলো না। মোটামুটি এই ব্যাপার।’

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। তাহলেতো আপনার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ দেখছি না। কেন আপনার মনে হচ্ছে যে মৃত্যুটাতে কোনও রহস্য আছে।”

“ঐ যে বললাম হঠাৎ দুবার করে সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করা।”

প্রমথ বলল, “ব্রেকারটাতো ডিফেক্টিভ হতে পারে।”

“তা পারে অবশ্য। তবে আরেকটা কারণও রয়েছে আমার চিন্তার। আমার ধারণা বাবা কোনও একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।”

“কিরকম ঝামেলা স্যার ?”

“তা বলতে পারবো না। তবে ওঁকে একটু বিমর্ষ দেখতাম। দুয়েকবার প্রশ্ন করেছি। কিন্তু সন্তোষজনক কোনও উত্তর পাই নি। আম্মার সঙ্গেও একটা দূরত্ব লক্ষ্য করেছি। এমনকি জামালচাচার সঙ্গেও খিটমিট করতেন। ওঁর মৃত্যুর পর জামালচাচার কাছে শুনেছি যে, ব্যবসাতে অনেক গণ্ডগোল চলছিল, তাই ওঁর মনটা ভালো ছিল না। জামালচাচা নিজেও বাবার মৃত্যুতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ব্যবসার ওঁর নিজের অংশটা জামালচাচা বিক্রি করে দেন। একটু অর্থকষ্টের মধ্যেও পড়েছিলেন।”

“কেন জানেন স্যার ?

ব্যবসার দেনাটেনাই হবে নিশ্চয়। বাবার ব্যবসাতে আমার নিজের কোনও আগ্রহ ছিল না। আমি বাবাকে বলেছিলাম যে, ওতে আমি নিজেকে জড়াবো না। তাই জামালচাচা যখন এসে আমাকে আমার অংশটা বুঝে নিতে বলেন, আমি কোনও উৎসাহ দেখাই নি। তাতে উনি একটু ব্যথিতই হয়েছিলেন।"

"আপনার বাবার অবর্তমানে আপনাদের তরফ থেকে কোম্পানিটা দেখভাল কে করছেন?"

"আম্মা আর আমি জামালচাচাকে অনুরোধ করেছি সেটা করতে, আর তারজন্য পারিশ্রমিক নিতে।"

"আপনার বাবার কোনো উইল ছিল স্যার ?"

"যদ্দুর জানি, না। বাবা মাঝে মাঝে উইলের প্রসঙ্গ তুলতেন, কিন্তু আমি ওঁকে বলে দিয়েছিলাম যে ওঁর সম্পত্তি আমি চাই না। আমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবো। আমার ঐরকম মনোভাব দেখেই হয়তো ও নিয়ে আর এগোন নি।"

"কিন্তু স্যার, উইলতো শুধু আপনার জন্য নয়, আপনার আম্মার জন্যেও।"

"তা ঠিক।" মামুদ একটু লজ্জিত হল। "কিন্তু জামালচাচা আমার মনোভাব জানেন। আমাদের বাড়ি নিয়ে আম্মার একটু দুশ্চিন্তা ছিল - জামালচাচাই কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন। আমি ওঁকে কাগজপত্র তৈরি করতে বলেছি যাতে আম্মার নামে বাড়িটা হয়।"

কথাটা শুনে আমার খটকা লাগলো। ছেলের সঙ্গে বাড়ির ভাগাভাগি নিয়ে চিন্তা - তাহলে কি আম্মা মামুদের সৎমা? একেনবাবুর ভুরুটাও একটু কুঁচকোলো। কিন্তু একেনবাবু তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "দ্বিতীয়বার যখন সার্কিট ব্রেকার অন করতে গেলেন স্যার, তখন কাউকে দেখেছিলেন?"

"আমি যখন বাড়িতে ঢুকছিলাম, তখন মিস্টার খানকে দেখেছিলাম দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন। আমাকে দেখে বললেন, কি আবার আলো নিভে গেল নাকি?

আমি বললাম, হ্যাঁ, এই এক্ষুণি। কিন্তু আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে উনি ঝড়ের বেগে টেনিস কোর্টের দিকে চলে গেলেন।"

"একটু স্ট্রেঞ্জ স্যার, তাই না?"

"উনি একটু অদ্ভুত ধরণেরই লোক।"

"কি করেন উনি?"

"মিস্টার খানকে আমি ভালো চিনি না। শুনেছি ওঁর অনেক পলিটিক্যাল কানেকশন আছে।"

"আপনার বাবার বন্ধু ?"

“না, বাবা ওঁকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক ওঁকে ঘাঁটাতে চাইতেন না। শুনেছি বাবার ফ্যাক্টরিতে একবার প্রচণ্ড লেবার ট্রাবল হয়েছিল - যাঁর পেছনে উনি ছিলেন। পরে অবশ্য মিটমাট হয়। আমার ধারণা তার জন্য বাবাকে বেশ ভালো অঙ্কের টাকা দিতে হয়েছিল মিস্টার খানকে। সেইজন্য জামালচাচা সব সময়ে বাবাকে বলতেন বাবার সব পার্টিতে উনি যেন নিমন্ত্রিত হন এবং ওঁকে যাতে বিশেষ সমাদর করা হয়। ভালো না করতে পারলেও খারাপ করতে উনি নাকি ওস্তাদ।”

“ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার। মিস্টার খান ছাড়া, দ্বিতীয়বার আর কাউকে দেখেছিলেন?”

“রহিম মালী, আয়েষার যে বাবা - তাকে দেখেছিলাম সিঁড়িঘরে। আয়েষার খোঁজে এসেছিল।”

“আয়েষাকে দেখেছিলেন?”

“না।”

“সাইডের দরজাটা খোলা ছিল। সেখান দিয়েই হয়তো বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি রহিমকে একটু বকলামও সাইডের দরজাটা বন্ধ করে না রাখার জন্য। সাধারণত: ওটা রাত্রে ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। রহিম অবশ্য বলল যে, ও দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে বাড়িতে গেছে। তবে আমাদের বাড়িতে এ ব্যাপারে কোনও ডিসিপ্লিন নেই - যে যার খুশী যেদিক দিয়ে ইচ্ছে বেরিয়ে যায়। বাড়িতে দিনরাত্রি বাবার এক নার্স থাকে, আম্মারও একজন হেল্পার

আছে। এছাড়া রাঁধুনি, দুজন কাজের লোক, মালী - তারা কখন কোথা দিয়ে বেরোচ্ছে না বেরোচ্ছে - তার কোনও ঠিক নেই।"

"আই সি। আপনাদের বাড়ির মালী বা কাজের লোকরা থাকে কোথায়?"

"ওদের থাকার জায়গাগুলো আমাদের কম্পাউণ্ডের পেছনে। তবে দিন আর রাত্রির দুজন নার্স বাইরে থেকে আসে।"

"তাঁদের কেউ কি পার্টিতে ছিলেন?"

"না, বাবা বা আম্মা বাড়ির কাজের লোকদের পার্টিতে থাকা পছন্দ করতেন না।"

"আচ্ছা, আপনার বাবার মৃত্যুটা যদি সত্যই স্বাভাবিক না হয়, তাহলে কাকে আপনার সন্দেহ হয়?"

"এইবার আমায় মুশকিলে ফেললেন। তেমন ভাবে কাউকেই সন্দেহ হয় না। তাছাড়া পুলিশ সন্দেহের কিছু দেখে নি। তবে আগেই বলেছি বাবার চিঠিটা আমাকে বিব্রত করেছে।"

"চিঠিটা স্যার, আপনার কাছে আছে?"

"হ্যাঁ, এই দেখুন।"

"পড়তে পারি স্যার ?"

“নিশ্চয়, সেইজন্যেইতো দিলাম।”

ছোট্ট চিঠি - কথাগুলো হুবহু আমার মনে নেই। তবে মূল বক্তব্য হল, মাসুদ সাহেব আশঙ্কা করছেন যে, হঠাৎই ওঁর একদিন মৃত্যু হবে। তাতে ওঁর দুঃখ নেই, কারণ বাঁচার ইচ্ছেও ওঁর ফুরিয়েছে। যাইহোক, মামুদের নামে যেসব শেয়ার উনি করিয়েছিলেন আর ওঁদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের পাশবই আনোয়ারের কাছে রেখে দিয়ে যাচ্ছেন। বাবার স্মৃতির কথা স্মরণ করে এগুলো যেন মামুদ গ্রহণ করে। শেয়ারগুলো ক্যাশ করতে চাইলে আনোয়ার এব্যাপারে মামুদকে সবরকমের সাহায্য করবেন। আরও কিছু কথা - যেগুলো ঠিক মনে নেই।

চিঠিটা পড়ে একেনবাবু বললেন, “একটু পাজলিং স্যার, তাই না? তবে কিনা হঠাৎ করে মৃত্যু - খুন না হয়ে হার্ট অ্যাটাকেওতো হতে পারে।”

মামুদ মাথা নাড়ল। “কিন্তু বাবা এইভাবে মৃত্যু চিন্তা আগে কখনও করেন নি। তাই আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক লেগেছে।”

“আই সি। ভালোকথা স্যার, পার্টির কোনও ছবি আছে?”

মামুদ কথাটার অর্থ বুঝল না। জিজ্ঞেস করল, “কার কথা বলছেন?”

“বলছি স্যার, আপনার বাবার সেই পার্টির সময়ে কেউ ছবি তুলছিলেন?”

“আমিই তুলে-ছিলাম কয়েকটা আমার ক্যামেরায়।”

“সেগুলো আছে আপনার কাছে?”

“হ্যাঁ। অনেকগুলো ছবির সিডি আমি নিয়ে এসেছি। সেখানে পার্টির ছবি নিশ্চয় কয়েকটা আছে।”

“নিয়ে আসুন না স্যার, একটু দেখি।”

“আমাকে একটু খুঁজতে হবে।”

“আমরাও আছি স্যার, আপনিও আছেন। যখন পাবেন স্যার, নিয়ে আসুন স্যার। আর বাড়ির ছবিগুলোও।”

“বেশ, কিন্তু আপনার কি মনে হয় - যা শুনলেন এখন পর্যন্ত।”

“ফ্র্যাঙ্কলি স্যার, আই হ্যাভ নো ক্লু।”

তিন

পরের দিন বিকেলে আবার মামুদ আর তারেক এলো। মামুদ একটা সিডি নিয়ে এসেছে। আমার ল্যাপটপটা অফিসে ফেলে এসেছি। প্রমথ ওরটা বার করে দিল, কিন্তু খুবই ব্যাজার মুখে। ওর সবসময়েই ভীতি ওর কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকবে - বিশেষ দেশী ভাইদের কোনও ডিস্কেট বা সিডিকে ও বিশ্বাস করে না। আমাদের সবার কম্পিউটারই নাকি ভাইরাসে জর্জরিত, আর আমরা সেটা জানিওনা। তবে আজকে ওর নিজের একটা আগ্রহ ছিল বলেই দিল, কিন্তু তার আগে ধমকের সুরে বলল, "ভাইরাস ফাইরাস নেইতো মামুদ, তোমাদের দেশেতো ওগুলো কিলবিল করে।"

আমার কথাটা শুনে লজ্জা লাগলো। বললাম,"কি বলছিস যাতা !"

"কেন, কথাটা ভুল বললাম। কি তারেক ভুল বললাম কথাটা আমি?"

তারেক অতিশয় ভদ্র ছেলে। বলল, "আরে না দাদা, ভুল বলবেন কেন। তবে মামুদের সিডি-তে ওসব পাবেন না।"

"কেন, মামুদকে ভাইরাসরা ভয় পায়?"

আমি বললাম, "তুই চুপ করবি?"

মামুদ সিডি থেকে বেছে একটা ছবি বার করল। পার্টির আয়োজন যখন শুরু হচ্ছে - সেই সময়কার ছবি। টেবিল আর চেয়ারগুলো পাতা হয়েছে টেনিস কোর্টে। প্রতিটা টেবিলে সবুজ রঙের চাদর পাতা আর তারওপর বড় সাদা ফুলদানী। সেখানে সেখানে রঙ-বেরঙের একগুচ্ছ করে ফুল।

"আপনার বাবা কোন টেবিলে বসেছিলেন স্যার ?"

মামুদ দেখালো টেবিলটা। ওটা গাড়ি-বারান্দার খুব কাছে। ওখান থেকে উঠে একটু গেলেই কোর্ট থেকে বেরিয়ে যাবার গেট। সেখানে গাড়ি-বারান্দা পেরোলেই বাড়ির বারান্দা।

"দাঁড়ান এই ছবিটায় আরেকটু ভালো করে দেখতে পাবেন, বলে মামুদ আরেকটা ছবি বার করল।"

বেশ বড় গোল টেবিল। চারিদিকে গোটা দশেক চেয়ার সাজানো।

"আপনার বাবা ঠিক কোথায় বসেছিলেন স্যার ?"

"আমি সিওর নই। হয় এই চেয়ার অথবা তার পাশেরটা," একটা চেয়ার দেখিয়ে মামুদ বলল।

"আই সি। আচ্ছা স্যার, আর কে কে ওঁর সঙ্গে বসেছিলেন?"

মামুদ একটু চিন্তা করে বলল, "আম্মা, কবীর সাহেব, আজিজুলচাচা, মিস্টার খান। কয়েকটা চেয়ার ফাঁকা ছিল মাঝে মাঝে জামলচাচা ওখানে বসছিলেন।

আমিও দুয়েকবার গিয়ে বসেছি। অন্যান্য নিমন্ত্রিতরাও মাঝে মাঝে এসে বাবার সঙ্গে বসে গল্প করে যাচ্ছিলেন।"

"যাঁদের কথা বললেন, তাঁরা কি করেন?"

"আজিজুলচাচা বাবার থেকেও বয়সে বড়। স্কুলে বাবার মাস্টারমশাই ছিলেন। খুব ভালো লোক, তবে কানে খুব কম শোনেন। কবীর সাহেব এক সময়ে বাবাদের পার্টনার ছিলেন। কয়েক বছর আগে বাবা আর জামালচাচার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে চলে যান। নিজে একটা বিজনেস শুরু করেন। সেই বিজনেস অবশ্য ভালো চলে নি। পার্টির কয়েক মাস আগে বাবার কাছে এসে ক্ষমাটমা চেয়ে আবার বিজনেসে জয়েন করতে চান বলে জানান। জামালচাচা ওঁকে ফেরত্ নিতে চাইছিলেন, কিন্তু বাবার আপত্তি ছিল। কবীর সাহেব আম্মাকে এসে ধরেছিলেন। আম্মাও বাবাকে অনেকবার বলেছিল ওঁকে পার্টনার করে নিতে। বাবা শেষমেষ বোধহয় রাজি হয়েছিলেন। তবে এই ফিরে আসা নিয়ে কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা হচ্ছিল বলে শুনেছি। কিন্তু কবীর সাহেব মাঝে মাঝেই বাবার কাছে এ নিয়ে তদবির করতে আসতেন।'

"মিস্টার খানকে কি বিশেষ সম্মান দেবার জন্য আপনার বাবার টেবিলে বসানো হয়েছিল স্যার ?"

"তা নয়। সবাই ঘুরে ঘুরে নানান চেয়ারে বসছিলেন। আম্মা, কবীর সাহেব আর আজিজুলচাচা সব সময়েই বাবার টেবিলে ছিলেন। মিস্টার খান খানিক বাদে এসেছিলেন।"

একেনবাবুর কানে কথাটা কত গেলো বুঝলাম না, কারণ উনি মন দিয়ে ছবিটা দেখছেন আর মাথা নাড়তে নাড়তে বলছেন, "ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার, ভেরি ইন্টারেস্টিং।"

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "কি এতো ইন্টারেস্টিং?"

"এই ফুল যে বাংলাদেশে হয় স্যার - আমার জানা ছিল না।'

কথাটা শুনে মামুদ খুশি হল। "আপনি বেশ ফুল চেনেন দেখছি!"

"তা স্যার একটু একটু চিনি। টবের এই আবছা গোলাপী ফুলগুলোতো মনে হচ্ছে হাইড্রেঞ্জিয়া - তাই না?"

"ঠিকই ধরেছেন।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "কোনগুলোর কথা বলছেন?"

"এই যে স্যার, দেখুন।"

দেখলাম অসংখ্য পাপড়িতে ঠাসা বেশ বড় গোল গোল সাদা আর আবছা গোলাপি রঙের ফুল। টবের পর টবে ফুটে আছে। মধ্যে কয়েকটা অন্য ধরণের গাছ, তবে দুটো গাছ ছাড়া লম্বায় হাইড্রেঞ্জিয়ার থেকে তারা ছোট। বড় দুটো গাছের একটা আমি চিনতে পারলাম - ম্যাগ্নোলিয়া। আমাদের

ক্যাম্পাসেই একটা আছে - আমার অফিস ঘর থেকে দেখা যায়। কিন্তু টবেও যে সেটা হয়, তা জানা ছিল না। টব দুটো অবশ্য খুবই বড়।

“হাইড্রেঞ্জিয়ার কম টব নেই আপনাদের বাগানে। এই ছবিতেইতো অন্ততঃ গোটা পঁচিশেক দেখছি।”

“হ্যাঁ, এটা বাবার পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া নেশা। প্রতি বছর টবে তিরিশটা করে হাইড্রেঞ্জিয়া গাছ করতেন - এটা আমি জন্মকাল থেকে দেখে আসছি।”

“কোত্থেকে গাছগুলো পেয়েছিলেন?”

“এই ট্র্যাডিশন চলে আসছে আমার বাবার আব্বার সময় থেকে। তিনি ছিলেন গাছপাগল লোক - জমিদার নগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর খুব বন্ধু ছিলেন। আপনারা হয়তো ওঁর নাম জানেন না, কিন্তু বাংলাদেশে এখনও নগেন্দ্রনারায়ণের একটা পরিচিতি আছে। পৃথিবীর নানা জায়গা উনি থেকে বীজ আর চারা সংগ্রহ করে একটা চমৎকার বাগান করেছিলেন। বাবার আব্বাকেও তার কিছু কিছু বীজ আর চারাগাছ দিয়েছিলেন। তবে বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু হাইড্রেঞ্জিয়া আর কয়েকটা গাছ এখনও আছে।”

“আপনার শখ নেই স্যার ?”

মামুদ একটু চুপ করে বলল, “আমিতো এখন এখানে। আর আম্মার সেরকম শখ নেই।”

“টু ব্যাড স্যার, এরকম চমৎকার গাছগুলো - দেখেও আনন্দ।”

“তা ঠিক, তবে নেশা না থাকলে এগুলো করা কঠিন। শীতের দেশের পেরিনিয়াল গাছগুলোকে আমাদের দেশে বাঁচিয়ে রাখা সোজা ব্যাপার নয়।’

“আমিও তাই ভাবছিলাম স্যার, এই গাছগুলোকে গ্রীষ্মকালে কোথায় রাখেন?”

“বাবা অনেক পয়সা নষ্ট করেছেন এগুলোর পেছনে। গাছের জন্য বাড়ির পেছনে ঘর বানিয়েছেন। এককালে বরফ দিয়ে ঘর ঠাণ্ডা রাখা হত, পরে এয়ার কণ্ডিশানার এলো। নেশাগ্রস্থ না হলে এগুলো করা যায়?”

“অ্যামিজিং স্যার, ট্রুলি অ্যামেজিং। কোনওদিন যদি ঢাকায় যাওয়া হয়, তাহলে একবার আপনাদের বাড়ি গিয়ে গাছগুলো দেখবো।”

“অবশ্যই যাবেন।”

“বাড়ির আর কোনও ছবি এই সিডি-তে আছে স্যার?”

“একটা নয়, অনেক। দাঁড়ান দেখাচ্ছি। এখানে আসার মাস দুয়েক আগে বেশ কিছু ছবি আমি তুলেছিলাম। তাতে বাড়ির ভিতরকার ছবি, সামনের রাস্তা, বাগান - কিছুই বাদ দিই নি। দাঁড়ান, কোন ফোল্ডারে রয়েছে দেখি। ও হ্যাঁ, এইখানে।” বলে ফোল্ডারটা খুলে একটা ছবি ক্লিক করল।

“এই যে দেখুন, এটা হল গাড়িবারান্দা দিয়ে বাড়িতে ঢুকলে সামনের যে বারান্দাটা চোখে পড়ে। সোজা যে দরজাটা, সেটা বাবার অফিস ঘরে যাবার। এখন ৯০ ডিগ্রী ঘুরে ডানদিকের যে দরজাটা - সেটা দিয়ে ঢুকলে একটা লম্বা হল পাবেন। তার বাঁ পাশে ছটা পরপর গেস্ট রুম - প্রত্যকটার সঙ্গেই

অ্যাটাচড বাথরুম। আর ৯০ ডিগ্রী উল্টো ঘুরে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলে প্রথমেই লিফ্ট। তারপর উপরে যাবার সিঁড়ি; পাশেই ছেলেদের জন্য একটা বাথরুম। তারপরে একটা বড় হলঘর। বৃষ্টি হলে সেখানেই পার্টিগুলো হয়। হলঘরের শেষে মহিলাদের জন্য একটা বাথরুম। তারপর একটা ছোট কিচেন - পার্টির সময়ে শুধু ওটা ব্যবহার করা হয়। হলঘরটা শেষ হয়েছে সিঁড়ির ঘরে। ওখানেই সার্কিট ব্রেকার বক্সটা। একেবারে শেষে একটা সাইডের দরজা। কাজের লোকরা ওটা দিয়েই বাড়িতে ঢোকে, ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় যায়। গেস্টরুমের হলঘরের শেষেও একটা দরজা আছে। কাজের লোকদের ঢোকার জন্য। উপরে যাবার একটা সিঁড়ি ছিল, কিন্তু সে দরজাটা সব সময়ে বন্ধ থাকে। দোতালাটা শুধু আমাদের আর আত্মীয়স্বজন কেউ এলে তাদের জন্য কয়েকটা ঘর রয়েছে। এখানে একটা হল ঘরের, আলাদা ছবিও আছে। দাঁড়ান দেখছি কোথায়।"

"এক কাজ করা যাক স্যার," একেনবাবু বললেন, "এই সিডিটা আমি রেখে দি, পরে ধীরে সুস্থে আমি দেখবো।"

মামুদ লজিত হয়ে বলল, "আপনি বোধহয় খুব বিরক্ত করে দিয়েছি - তাই না?"

"মোটেই না স্যার। তবে এগুলো অনেক সময়ে দিয়ে দেখতে হবে। আপনার যদি সিডিটা রেখে যেতে কোনও আপত্তি না থাকে, তাহলেই ....."

"কী আশ্চর্য, আপত্তি থাকবে কেন?"

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।”

“আর কিছু জানতে চান?” মামুদ ওঠার আগে জিজ্ঞেস করল।

“না স্যার, আপাততঃ এই যথেষ্ট। এই সিডি-টাতো দিয়ে গেলেন। একটু ভালো করে দেখি। চোখে দেখার মতো বড় কিছু নেই স্যার।”

মামুদ আর তারেক চলে যাবার কিছুক্ষণ পর আমি আর প্রমথ একেনবাবুকে চেপে ধরলাম, “কি বুঝলেন মশাই?”

“হয়তো নর্মাল ডেথই স্যার। তবে গোলমাল কিছু থাকলেও আশ্চর্য হব না।”

“বাঃ, খুব প্রোফাউণ্ড স্টেটমেণ্ট,” প্রমথ খোঁচা দিয়ে বলল।

“তারমানে কেসটা আপনি নিচ্ছেন?” আমি বললাম।

“কিসের কেস স্যার ?”

চার

এরমধ্যে একদিন বাড়ি ফিরে দেখি একেনবাবু কম্পিউটারের মনিটরে তন্ময় হয়ে মামুদের বাড়ি দেখছেন।

“কি দেখছেন এতো বিভোর হয়ে?”

“ফুলগুলো স্যার। হাইড্রেঞ্জিয়া ফুলগুলো দেখতে অপূর্ব।”

“তাতো বুঝলাম, কিন্তু শুধু সেগুলো দেখছেন বলেতো মনে হচ্ছে না।”

“কিযে বলেন স্যার, ফুলগুলোই দেখছি। দেখুন স্যার, কিরকম পিঙ্ক রঙের হাইড্রেঞ্জিয়ার মাঝখানে হঠাৎ চমৎকার একটা নীল রঙের হাইড্রেঞ্জিয়া।’

“দেখলাম, কিন্তু তাতে অবাক হবার কি কিছু আছে? হাইড্রেঞ্জিয়া কি নীল রঙের হয় না?”

“হয় স্যার, নিশ্চয় হয়।”

“তাহলে?”

“আসলে আগে এটাকে এখানে দেখি নি।”

“হয়তো টবটা অন্য জায়গায় ছিল। তাছাড়া একই গাছে তো নানান রঙের ফুলও হতে পারে। মেণ্ডেলের সূত্র জানেন না - কি ছাই এতো গাছের বই পড়েন!”

“এটা মন্দ বলেন নি স্যার। চা খাবেন?”

“আপনি বানাবেন?” আমি মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

“বানাতে পারি স্যার, কিন্তু আপনি অনেক ভালো বানান।”

“তাহলে আর চা খাবেন কিনা জিজ্ঞেস করলেন কেন, বললেই পারতেন একটু চা করে খাওয়াবেন কিনা?”

“আপনিও স্যার প্রমথবাবুর মতো হয়ে যাচ্ছেন,” একেনবাবু অনুযোগের ভঙ্গীতে বললেন।

“ঠিক আছে বুঝেছি, আসুন,” বলে আমি কিচেনে গেলাম। স্টোভে জল চাপিয়ে আমি খুঁজতে শুরু করলাম চা-পাতা কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা। পাওয়া গেল না। আমি টি-ব্যাগ একেবারেই পছন্দ করি না। তার থেকে ইনস্ট্যান্ট কফি ভালো।

“কফি চলুক, কি বলেন?”

“বেশতো স্যার, আমেরিকায় কফিই ভালো।”

জল গরম হতে কয়েক মিনিট, কফিও সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেল। কফি নিয়ে বাইরের ঘরে বসতেই একেনবাবু বললেন, "আচ্ছা স্যার, শরিয়ত আইন সম্পর্কে আপনি কি জানেন?"

"সেটা আবার কি, ইসলামিক আইন?"

"হ্যাঁ।"

"শূন্য। কেন?"

"না স্যার, ওদের উত্তরাধিকার আইনটা বেশ গোলমেলে। আমি অনেকদিন আগে একটু দেখেছিলাম, তারপর মাথা এতো ঝিমঝিম করতে শুরু করল যে, হাল ছেড়ে দিলাম।"

"শরিয়ত আইন নিয়ে হঠাৎ মাথা ব্যথা কেন।"

"একটা অঙ্ক মিলছে না স্যার, তাই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি।"

মানিকজোড়দের জিজ্ঞেস করুন, ওরা নিশ্চয় জানবে। তারেক আর মামুদকে প্রমথ ইদানীং মানিকজোড় বলতে শুরু করেছে - ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স, আমিও হঠাৎ হঠাৎ বলে ফেলি।

"কারা, তারেকসাহেব আর মামুদসাহেবের কথা বলছেন?"

"রাইট।"

“নাও জানতে পারেন স্যার, হিসেবটা বেশ গোলমেলে।”

“ভালোকথা ওদের খবর কি, কদিন ধরে বেপাত্তা !”

“কি একটা কাজে বাইরে গেছেন স্যার। আমিও খোঁজ করছিলাম।”

“আপনি কেন খোঁজ করছিলেন, প্রব্লেম সল্‌ভ হয়ে গেল নাকি?”

“কিযে বলেন স্যার। প্রব্লেম আছে কিনা তাই জানা নেই।”

“তাহলে কি জানতে চাইছিলেন?”

“হঠাৎ মনে হল স্যার বাইরের গাছ পরিবেশ পাল্টালে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন। আবহাওয়ার কথা ছেড়ে দিন, মাটি আলাদা, অন্যরকম পোকামাকড় - যেগুলোর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিরোধ ক্ষমতাই গাছগুলোর নেই - এইসবের বিরুদ্ধে লড়াই করে গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে - সোজা ব্যাপার নয়।”

“আপনি কি মামুদের বাড়ির হাইড্রেঞ্জিয়া, লাইলাক - ঐসব গাছগুলোর কথা ভাবছেন?”

“হ্যাঁ স্যার।”

“দেখুন আপনি এখন গাছ-বিশারদ হয়ে গেছেন, আপনাকে কিছু বলতে সাহস হয় না। তবে যদি পঞ্চাশ বছর ধরে গাছগুলো বাংলাদেশেই জন্মায় আর মরে থাকে, তাহলে প্রতিরোধশক্তিটা বোধহয় এতদিনে গড়ে উঠেছে।”

“এটা ভালো বলেছেন স্যার। সমস্যাটা প্রথম দিকেই হয়েছিল।”

“নিশ্চয় হয়েছিল, কিন্তু তার উত্তর মামুদ দিতে পারবে না। ওর ঠাকুরদা হয়তো পারতেন।”

“গুড পয়েন্ট স্যার,” একেনবাবু অন্যমনস্ক ভাবে বললেন। তবে আমার বক্তব্য উনি কতটা কানে দিলেন সেটা অবশ্য বুঝলাম না।

কোথাও নিশ্চয় একটা টেলিপ্যাথি কাজ করছিল। দরজায় বেল শুনে দেখি মামুদ আর তারেক।

“তোমাদের কথা হচ্ছিল,” আমি বললাম। “একেনবাবু ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তোমাদের এইসব বিদেশি গাছের মাটি, সার, ইনসেক্টিসাইড - এইসব সম্পর্কে।”

আমার কথাটা ধরতে না পেরে মামুদ একটু কনফিউসড মুখে তাকালো।

ব্যাপারটা ওকে বিশদ করে বলতেই বলল, “মাটির ব্যাপারটা জানি, কিন্তু সার আর ইনসেক্টিসাইড সম্পর্কে কিছুই জানি না।”

“মাটির ব্যাপার মানে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“প্রতি বছর বাবা বাংলাদেশের উত্তরের কোন একটা জায়গা থেকে মাটি আনাতেন। কেন, সে প্রশ্ন করবেন না। বাবা বিশ্বাস করতেন ঐ মাটি না

পেলে গাছ বাঁচবে না। আমার ধারণা ওঁর আব্বা সেখান থেকে প্রথমে মাটি এনেছিলেন, তাই বাবা আর চান্স নেন নি।"

"তুমি না জানলে, সে মাটি এখন আসবে কোত্থেকে?"

"ধরে নিচ্ছি জামালচাচা জানেন। নইলে সমস্যা। তারওপর আমিতো এখানে।"

"এই যে একেনবাবু," আমি ঠাট্টার সুরে বললাম, "কি ধরণের মাটি দরকার? অনেক বইপত্রতো লাইব্রেরি থেকে এনেছেন, ছেলেটাকে একটু হেল্প করুন।"

"আপনি স্যার সত্যিই প্রমথবাবুর মতো হয়ে যাচ্ছেন।" একেনবাবু অনুযোগ করলেন।

"সেটা কি কমপ্লিমেন্ট?"

"রান্নার ব্যাপারে নিশ্চয় স্যার। দুর্দান্ত কফি বানিয়েছেন আজ।"

"আরেক কাপ চান নাকি?"

"চাই স্যার, কিন্তু বলতে বাধো বাধো ঠেকছে।"

"আমি ওদের জন্য বানাচ্ছি। সুতরাং আরেক কাপ বানাতে অসুবিধা নেই।"

"বাঁচালেন স্যার। আসলে আজ মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

আরেক প্রস্থ কফি বানানো হল। আমার চেয়ে তারেকই বেশি খাটলো। কাপডিশ ধুয়ে জল গরম করে; আমি শুধু আধ চামচ ইনস্ট্যাণ্ট কফির গুঁড়ো ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়লাম।

কফি খেতে খেতে একেনবাবু হঠাৎ মামুদকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা স্যার, আপনার আম্মাকে দেখে খুব বেশি বয়স কিন্তু মনে হল না।"

"খুব বেশি বয়স ওঁর হয় নি।"

একেনবাবু বোধহয় দ্বিতীয় প্রশ্নটা করবে কিনা ভবছিলেন। তার আগেই মামুদ বলল, "উনি আমার নিজের মা নন।"

"আপনার নিজের মা স্যার ?"

"তিনি অনেকদিন হল মারা গেছেন।"

একেনবাবু চোখে তখনও প্রশ্ন দেখে মামুদ বলল, "আমার এই আম্মাকে বাবা বিয়ে করেন বছর দশেক আগে।"

এটুকু বলার পর মামুদের স্বাভাবিক সংযম ভেঙ্গে গেল। অনেকগুলো কথা প্রায় অনাবশ্যক ভাবেই বলে ফেলল। "আমার সঙ্গে আমার আম্মার সম্পর্ক ভালো নয়। উনি আমার থেকে বছর কয়েকের মাত্র বড়। খুব গরীব ঘর থেকে এসেছেন। কেন এবং কীভাবে বাবার সঙ্গে ওঁর পরিচয় বা শাদী হল আমি বলতে পারবো না। আমি বোর্ডিং স্কুলে পড়তাম এসে দেখি উনি বাড়িতে এসে গেছেন। কিন্তু ওঁর সঙ্গে কোনোদিনই আমার বনে নি - দরকার

মতো কথাবার্তা হত, এইটুকুই। বাইপাস হবার আগে যখন বাবার প্রাণ প্রায় যায় যায় হয়েছিল, তখন প্রথম আম্মা আমার সঙ্গে অত্যন্ত সুব্যবহার শুরু করেন। আসলে ওঁর বোধহয় ভয় হয়েছিল বাবার মৃত্যুর পর আমি যদি ওঁকে না দেখি। সে ব্যাপারে ওঁর কোনও চিন্তা নেই এটা আমি ওঁকে নিশ্চিত করেছিলাম। তাছাড়া জামালচাচাও তখন এগিয়ে এসে ওঁকে সাহস দিয়েছিলেন যে ওঁর কোনও অর্থকষ্ট বাবা হতে দেবেন না বলে।"

"কেন স্যার, আপনাদের শরিয়ত আইনে বিধবা স্ত্রীরা কিছু পান না?"

"কিছু পান। ধারদেনা সব বাদ দিয়ে যা থাকে তার ১/৮ অংশ উনি পেতেন, আমি বাকি অংশ। তবে বাবার ধারদেনা কি ছিল, সেটা আমরা জানতাম না। আর উনি যেরকম আরামের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হযেছিলেন, সেই ঠাট ওঁর পক্ষে বজায় রাখা সম্ভব ছিল না।"

"আপনার বাবার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কিরকম ছিল?"

এর উত্তর সোজাসুজি মামুদ দিল না। শুধু বলল, "আম্মা কমবয়সী এবং সুন্দরী - বাবা পছন্দ করেই শাদী করেছিলেন।"

"আপনার আম্মার কোনও ছেলেপুলে হয় নি স্যার ?"

"একটি হয়েছিল, শাদীর কয়েক বছর পরে। কিন্তু বাচ্চাটা জন্মানোর সময়ে মারা যায়।"

“আপনি বলেছিলেন স্যার, আপনার বাবা মারা যাবার কিছুদিন আগে থেকে আপনার আম্মা আর বাবার মধ্যে একটা দূরত্ব লক্ষ করেছিলেন। তারমানে স্যার তার আগে নিশ্চয় ওঁদের সম্পর্কটা ভালো ছিল। আমি কি ভুল বলছিস স্যার ?”

মামুদ এবার লজ্জিত হল। “আপনি ভুল বলেন নি। আসলে আম্মাকে পছন্দ করি না বলেই ওর সম্পর্কে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার অসুবিধা হয়।”

“আই সি স্যার। আচ্ছা, আপনাদের সমাজে দেনমোহরের একটা ব্যাপার আছে না?”

“বুঝেছি, আপনি কি জানতে চাচ্ছেন। না, আমার মনে হয় না, বাবা ওঁকে বিয়ে করার সময়ে বিরাট কোনও দেনমোহরে রাজি হয়েছিলেন বলে। আমি জোর করে কিছু বলতে পারবো না। কিন্তু বাবার অসুখের সময়ে আম্মা সেই নিয়ে আমাকে ওঁর চিন্তার কথাটা বলেছিলেন।”

“দেনমোহর ব্যাপারটা কি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“ওটা খানিকটা আপনাদের স্ত্রীধনের মতো। মুসলমান স্বামীরা দেনমোহরের টাকাটা মৃত্যুর আগে স্ত্রীকে দিয়ে যেতে বাধ্য। অর্থাৎ কেউ মারা গেলে তাঁর সম্পত্তি থেকে দেনমোহরের টাকাটা প্রথমেই বিধবা স্ত্রীর কাছে চলে যায়, তারপর অন্যান্য ঋণ কর্জ ইত্যাদি মিটিয়ে যা বাকি থাকে সেটাই ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করা হয়।”

“আপনার বাবার কোনও লাইফ ইন্সিওরেন্স ছিল?”

“না।”

“আপনি শিওর ?”

“হ্যাঁ, কারণ আনোয়ারচাচা বাবকে বেশ কয়েকবার বলেছিলেন লাইফ ইন্সিওরেন্সের কথা, বাবা আমল দেন নি। বলতেন, ঘরবাড়ি সম্পত্তি উনি যা রেখে যাচ্ছেন, সেটাই ওঁর সবচেয়ে বড় ইন্সিওরেন্স।”

“ভেরি ইন্টারেস্টিং,” একেনবাবু বললেন।

“কি ইণ্টারেস্টিং?”

“ঐ যা: স্যার, সাতটা বেজে গেছে, আজ আবার ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।” এই বলে তড়িঘড়ি জুটোটুতো পরে ‘চললাম স্যার’ বলে অদৃশ্য হলেন।

মামুদ আর তারেকের হতম্ভম্ব ভাবে বসে আছে দেখে আমি বললাম,
“টিপিক্যাল একেনবাবু. মাথায় কি ঘুরছে, কারোর বোঝার সাধ্যি নেই।”

পাঁচ

আজ সকাল থেকে একেনবাবু আবার বারান্দার গাছগুলো নিয়ে লেগেছেন। আমাকে অনেকক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন একটা বড় আয়না কিনে সেটা যদি বারান্দার রেলিং-এর সঙ্গে একটা ব্র্যাকেট আটকে তার অন্য প্রান্তে লাগানো যায়, তাহলে সূর্যের আলো তাতে রিফ্লেক্ট হয়ে ওঁর দুটো টবে অন্তত: পড়বে। ওঁর দুটো টবই হচ্ছে সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল। অন্যগুলোতে যেসব গাছ আছে তারা ছায়াতেও বাঁচবে, যদিও ফুল ভালো হবে না।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, "আপনি ঠিক চেক করে দেখেছেন দুটো টব আলো পাবে কিনা।"

"হ্যাঁ স্যার, থিওরি অফ ফিফ্লেকশনতো সহজ অঙ্ক। কঠিন ব্যাপার হল আপনাদের সম্মতি পাওয়া।"

"সেটা পাবেনও না, প্রমথ বলল, আয়না ভেঙ্গে নিচে কারোর মাথায় পড়লে খুনের দায়ে জেলে যাবে কে, আপনি না আমরা?"

"পড়ে যাবে কেন স্যার ব্র্যাকেটে নাটবোল্ট দিয়ে টাইট করে লাগানো থাকলে।"

“আপনি এক কাজ করুন, প্রমথ বলল, সবকটা টব মামুদকে দিয়ে দিন। ওদের কম্পিটেন্ট মালী আছে, বিদেশী গাছ বাঁচিয়ে অভ্যস্ত। ওরা আপনার গাছকে অনেক ভালো দেখভাল করবে।”

“আপনি স্যার, সত্যি!” একেনবাবু ওঁর এই ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়াটা এভাবে উড়িয়ে দেওয়া হল বলে একটু ক্ষুণ্ণই হলেন।

আমার খারাপ লাগলো। বললাম, “দোকানেতো গ্রো লাইট বিক্রি করে দেখেছি। তার একটা কিনে লাগান না।”

“ওগুলো খুব এফেক্টিভ নয় স্যার। কোথায় সূর্যের আলো আর কোথায় গ্রো ল্যাম্প।”

“আরে মশাই নেই মামার থেকেতো কানা মামা ভালো।’

“তা ঠিক।”

“ঠিক আছে আপনি যখন এতো ঘ্যানঘ্যান কাছেন, ইলেকট্রিসিটি না হয় আমরা শেয়ার করবো। তবে এও আপনাকে বলছি এর থেকে অনেক সস্তা হত যদি আপনি সপ্তাহ অন্তর কিছু ফুল বাড়িতে কিনে আনতেন। এই মাটি জলে বারান্দা কাদা করতেন না, ফুলও বাড়িতে থাকতো এবং তার ভ্যারাইটিও অনেক বেশি হত।”

“কিন্তু নিজের হাতে বাগান করার আনন্দটাতো থাকতো না।”

“সেটাতো শুধু আপনি উপভোগ করছেন। আমরা সাফার করছি। এক্ষেত্রে সবাই উপভোগ করতাম। আপনার ম্যাডাম ফ্র্যান্সিস্কাও।”

একেনবাবুর ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন। ঠিক এই সময়ে ফ্র্যান্সিস্কা এসে হাজির। একেনবাবুর কীর্তিকলাপ দেখে সে মুগ্ধ।

“মাই গড, কি চমৎকার গাছগুলো হয়েছে ডিটেকটিভ। আমি শিওর কদিন বাদেই বড় বড় ফুল হবে।”

“আই অ্যাম ট্রাইং ম্যাডাম,” একেনবাবু পরম উৎসাহিত হয়ে বললেন।

“আমাদের অনেক নেগেটিভ ফিডব্যাক সত্যেও,” প্রমথ গম্ভীর ভাবে বলল।

“তোমরা এতো নেগেটিভ কেন, নেচারকে নার্চার করছেন মাই ডিয়ার ডিটেকটিভ।” ফ্র্যান্সিস্কা একেনবাবুকে খুব পছন্দ করে। স্নেহভরে 'মাই ডিটেকটিভ' বলে ডাকে। একেনবাবুও ফ্র্যান্সিস্কাকে দেখলে মনে বেশ বল পান। এবং আমাদের বিরুদ্ধে যা যা কম্প্লেইন আছে সব নির্ভয়ে ব্যক্ত করেন। তারজন্য ফ্র্যান্সিস্কার মিষ্টি তিরস্কার আমাদের সহ্য করতে হয়। এটাই রুটিন।

“একটু সূর্যের আলো জোগাড় করার চেষ্টা করছিলাম ম্যাডাম, কিন্তু ওঁরা আপত্তি করছেন।”

“কেন?” ফ্রান্সিস্কা অনুযোগভরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালো।

“তুমিই জিজ্ঞেস করো না আইডিয়াটা কি?”

একেনবাবু বিশদ করে আয়নার কথাটা বললেন।

“দ্যাট্স ব্রিলিয়ান্ট,” সস্নেহে ফ্র্যান্সিস্কা বলল। "সিটি কোডে না আটকালে নিশ্চয় করা যেতো।"

এইখানেই আমাদের সঙ্গে ফ্র্যান্সিস্কার তফাৎ। বারণ করবে, কিন্তু এমন ভাবে করবে যে মনে হয় বারণ করছে না।

“কিন্তু ডিটেকটিভ আমাকে তোমার বলতে হবে তুমি কি ফার্টিলাইজার দিচ্ছ। ইমপেশেন্ট গাছগুলো সত্যি কি হেল্‌দি লাগছে!”

“মিরাকল গ্রো-র একটা স্পেশাল ব্র্যান্ড কিনেছি ম্যাডাম। দেখলাম ওটাই বলছে এই গাছের পক্ষে সবচেয়ে ভালো।”

“তুমি এক কাজ করো ডিটেকটিভ, আমার অ্যাপার্টমেণ্টের বারান্দায় আলো আসে। তোমার যে গাছগুলোতে আলো দরকার সেগুলো ওখানে রাখতে পারো। আমার শুধু দুয়েকটা ছোট পট আছে। তোমার কয়েকটা পট ওখানে রাখতে কোনও অসুবিধাই নেই।”

“থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ। প্রমথবাবুতো এগুলোকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিতে বলছিলেন।”

“ঢাকা, ইউ মিন বাংলাদেশের ঢাকা?”

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।”

ফ্রান্সিস্কা প্রমথর দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টি দিয়ে বলল, “ইউ আর রিয়েলি সো নটি!”

প্রমথ কাঁধ ঝাঁকালো।

“আজকে মেনু কি স্যার ?”

ফ্র্যান্সিস্কা এলেই এই টেকনিকটা একেনবাবু ব্যবহার করেন। ফ্র্যান্সিস্কা রান্না করতে ভালোবাসে। আরও ভালোবাসে খাওয়াতে। কিন্তু ফ্র্যান্সিস্কার রান্না করার ব্যাপারটা খুব ইলাবোরেট। আমাদের সমস্ত পট্স আর প্যান্স তাতে লেগে যায়। তারপর সেগুলো ধুতে ধুতে আমার আর প্রমথর প্রাণান্ত।। একেনবাবু অবশ্য ওঁর সার্ভিস ভলেন্টিয়ার করেন। কিন্তু সেটা নেওয়া মানে আরও বাড়তি কাজ। এখানে ওখানে নোংরা লেগে থাকবে। সেগুলো স্পট করে করে আবার ধোয়া। ফ্র্যান্সেস্কা রান্না করলে খাওয়াটাও যেমন তেমন ভাবে করা যাবে না। সুন্দর করে টেবিল সাজিয়ে, প্লেসম্যাটের উপর প্লেট, গ্লাস, ন্যাপকিন কাঁটাচামচ ইত্যাদি রেখে মোমবাতি জ্বালিয়ে স্যালাড্ ব্রেড ও ওয়াইন সহযোগে সেই রান্না খেতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা একটা প্রডাকশন। সেটা শর্ট কাট করা মানে ওকে কষ্ট দেওয়া। কে চায় কোনো সুন্দরীর কষ্টের কারণ হতে। তাছাড়া মেয়েটা রান্না করে চমৎকার, আর তারচেয়েও চমৎকার ওর হৃদয়টা। প্রমথর ভাগ্যি যে এরকম একটা মেয়ে ওর প্রেমে পড়েছে।

কিন্তু কাপ-ডিশ পট্‌স প্যান ধোয়ার রূঢ় বাস্তবটাও উপেক্ষা করা যায় না। তাই আবার খাবার ধুয়ো তুলেছেন দেখে প্রমথ ধমকে বলল, "আপনি এতো হ্যাংলা কেন মশাই, আবার পোঁ ধরলেন।"

ফ্র্যান্সিস্কা এখন বাংলা বেশ শিখে গেছে। সহজ সহজ কথাগুলো ধরতে পারে। তাছাড়া যে রেটে আমরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি, তাতে বাংলা না জানলেও মূল বক্তব্য মোটামুটি ভালোই বোঝে। কিন্তু 'হ্যাংলা' আর 'পোঁ' শব্দটা ও ধরতে পারলো না। জিজ্ঞেস করল, "'হ্যাংলা' কি?"

"ওটা ট্র্যানস্লেট করা যায় না," আমি বললাম।

"আর 'পোঁ'?

"ওটাও কঠিন," প্রমথ বলল।

একেনবাবু বললেন, "আসলে ম্যাডাম, আমি খাবারের কথা তুলেছিলাম বলে, ওঁরা রাগ করছেন, আপনাকে আবার রান্না করতে হবে বলে।"

"ওমা, এতে রাগের কি আছে। আমারতো ভালো লাগে রান্না করে সবাইকে খাওয়াতে।"

"আর আপনার রান্নাও একেবারে এক্সেলেণ্ট ম্যাডাম।"

"আচ্ছা নেমকহারামতো আপনি মশাই। প্রতিদিনতো বেশ ভালোই সাঁটান আমার রান্না।"

“কিযে বলেন স্যার। একজনকে ভালো বলা মানে কি আরেকজন খারাপ বলা। আপনার রান্নার প্রশংসা আমি সবজায়গাতেই করি।’

“ইউ আর সো কম্পিটিটিভ,” বলে প্রমথর মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে ফ্র্যান্সিস্কা রান্নাঘরের দিকে গেল। একেনবাবুও গেলেন ওর পেছন পেছন।

“মাঝে মাঝে একেনবাবুকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করে,” আমার কানে কানে সেটা জানিয়ে প্রমথও গেল কিচেনটাকে একেনবাবু আর ফ্রান্সিস্কার যুগ্ম আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে।

তবে ভগবান আছেন। একেনবাবুর একটা ফোন - ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের কাছ থেকে।

“মাই গড ---- আপনি শিওর স্যার ---- গ্রেট নিউজ। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ।”

ফোনটা নামাতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কি ব্যাপার ?”

“মামুদ সাহেবের বাবার ব্যাপারটা নিয়ে।’

“ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট এর মধ্যে জড়ালেন কি করে?”

“উনি বাংলাদেশের কনসাল জেনারেলকে খুব ভালো চেনেন স্যার। আমি কতগুলো জিনিস জানতে চেয়েছিলাম। উনি বাংলাদেশ কনসালের থ্রু-তে ঢাকা পুলিশকে দিয়ে কাজটা করিয়েছেন।”

“কি কাজ?” প্রমথর প্রশ্ন। কখন প্রমথ আর ফ্র্যান্সেস্কা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে দেখি নি।

“বলছি স্যার।”

ফ্র্যান্সিস্কা জিজ্ঞেস করল, “কি ব্যাপার ডিটেকটিভ, আমাকেতো কিছুই বল নি?”

“বলছি ম্যাডাম, বলছি। কিন্তু তার আগে, মামুদকে একটু খবর দেওয়া দরকার।”

“আমি ফোন করছি,” প্রমথ বলল, “আর সেই সঙ্গে পিৎজারও অর্ডার করি। ফ্র্যান্সিস্কা তাহলে রান্না করতে গিয়ে গল্পটা মিস করবে না।”

এক ঢিলে চমৎকার দুটো পাখি মারলো প্রমথ।

কয়েকমিনিটের মধ্যেই নিচ থেকে তারেক এলো। মামুদকে কোম্পানির কাজে দুদিনের জন্য শিকাগো যেতে হয়েছে। প্রমথ বলল, মামুদের জন্য অপেক্ষা না করে যা জানলেন আমাদের বলুন। ওকে না হয় আবার বলবেন।

এরমধ্যেই প্রমথ সংক্ষেপে ফ্র্যান্সিস্কাকে মামুদের বাবার মৃত্যুর ব্যাপারটা বলে দিয়েছে। সেও একেনবাবুকে বলল, "ডিটেকটিভ, সবকিছু না শুনে তোমাকে ছাড়বো না।"

ছয়

আমরা সবাই ভালোভাবে বসার পর একেনবাবু তারেককে বললেন "একটু আগে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ফোন করেছিলেন।"

"ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট?"

"উনি নিউ ইয়র্ক পুলিশের ক্রিমিনাল ডিভিশনের হেড। আমাকে খুব স্নেহ করেন স্যার"।

"না, না, ওঁর কথা আমি বাপীবাবুর কাছে শুনেছি, কিন্তু প্রসঙ্গটা বুঝতে পারছি না," তারেক বলল।

"মামুদ সাহেবের কেসের ব্যাপারটা নিয়ে স্যার - ওঁর কাছে একটু সাহায্য চেয়েছিলাম। তা উনি ফোনে যে খবরটা দিলেন সেটা শুনে আমি মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে মামুদ সাহেবের বাবার মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।'

কথাটা শুনে শুধু তারেক নয় আমি আর প্রমথও অবাক! ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ওঁকে এমন কি খবর দিতে পারেন যার থেকে এতদূরে বসে উনি এরকম একটা জোরদার কনক্লুশান করে ফেললেন।

"কি সর্বনাশ," তারেক বলল, "তারমানে মামুদ যা আশঙ্কা করছিল সেটাইতো ঠিক! কিন্তু আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন?"

“বলছি স্যার, সেইজন্যেই আপনাদের ডেকেছিলাম, কিন্তু মামুদ সাহেবকেতো পাওয়া গেল না।”

“ওর শিকাগো হোটেলের নম্বরটা আমার কাছে আছে।”

“কিন্তু ফোনে এটা না জানানোই ভালো স্যার।”

“তা ঠিক। তবে ফিরে এসে খবরটা যখন শুনবে - একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু আপনি এ ব্যাপারে একেবারে নিঃসন্দেহ?”

“মোটামুটি নিঃসন্দেহ স্যার, পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে গেলে ঢাকা পুলিশের আরও অনেক কিছু করণীয় আছে।”

“খুনী কে?” তারেক প্রশ্ন করল।

“স্যার, মামুদ সাহেব জানতে চেয়েছিলেন, মৃত্যুটা অস্বাভাবিক কিনা - সেটার উত্তর পাওয়াটা স্যার কঠিন হলেও দারুণ শক্ত নয়। কিন্তু খুনী কে সেটা এখানে বসে জোর দিয়ে বলাটা স্যার ফ্র্যাঙ্কলি অসম্ভব।”

“একটু কম জোর দিয়েই না হয় বলুন,” প্রমথ বলল।

“স্যার আমার একটা থিওরি আছে - সেটাই ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে বলেছি ঢাকার পুলিশকে জানাতে।”

“সেই থিওরিটা কী বলবেন?” তারেক জিজ্ঞেস করল।

“থিওরিটা পিওর থিওরি স্যার - ঠিক নাও হতে পারে।’

“আঃ এতো ভনিতা না করে শুরু করুন না,” প্রমথ এবার অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

“করছি স্যার, করছি। কিন্তু যা আমি বলছি, সেটা একটু সাফাই না গেয়ে বলাটা অনুচিত হবে।”

“সাফাইতো হল, এবার বলুন।”

একেনবাবু শুরু করলেন, “মামুদ সাহেবের বাবাকে খুন করা হয়েছিল ওঁর অরেঞ্জ জুসে পটাশিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে।’

“আপনি একেবারে বিষের নাম জেনে বসে আছেন!’ প্রমথ অবিশ্বাসভরে কথাটা বলল।

“সেই তথ্যটাই আমাকে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট দিলেন স্যার।”

“কি যাতা বলছেন মশাই। জুসটাতো পুলিশ পরীক্ষা করেছিল, কিছুই পায় নি !”

“সেটা জানি স্যার।”

“তাহলে?”

“আঃ,” আমি প্রমথকে ধমক দিলাম, “তুই চুপ করবি? একেনবাবুকে বলতে দে।”

“এত সাসপেন্স না দিয়ে সোজাসুজি বললেইতো চুকে যায়।’

“বলছি স্যার, সোজাসুজিই বলছি। কিন্তু জিনিসটাতে এতো প্যাঁচ রয়েছে যে গুছিয়ে বলাটা কঠিন।”

“ডিটেকটিভ, তুমি আস্তে আস্তে বলো আমরা শুনছি।” ফ্র্যান্সিস্কা এবার প্রমথকে চুপ করানোর ভার নিল।

“থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। আমি আলো নেভার ব্যাপারটা দিয়েই শুরু করি। আমার বিশ্বাস, আলোটা ওভারলোড বা ডিফেক্টিভ ব্রেকারের জন্য নেভে নি। ওটা সার্কিট ব্রেকার অফ করেই নেভানো হয়েছিল যাতে খুনী মাসুদ সাহেবের অরেঞ্জ জুসের গেলাসটা সরিয়ে সেই জায়গায় পটাশিয়াম সায়ানাইড মেশানো বিষাক্ত একটা গ্লাস রেখার সুযোগ পান। তারপরে আলো জলে উঠলো। জামালসাহেব আর মামুদ সাহেবের পিশেমশাই যখন টোস্ট দিলেন তখন সেই বিষাক্ত জুসটা মাসুদ সাহেব খেলেন। এখন খুনীর চিন্তা ছিল যে জুস খেয়ে মৃত্যু হলে সেই জুসটা সম্ভবত: পরীক্ষা করা হবে। সুতরাং এই বিষাক্ত জুসটাকে সরাতে হবে। সেইজন্য আবার বাতি নেভাতে হল। দ্বিতীয়বার আলো নেভা মাত্র খুনী মাসুদ সাহেবের বিষাক্ত গ্লাসটা পাল্টে ওঁর পুরনো গ্লাসটা সামনে রেখে দেন।”

“দাঁড়ান, দাঁড়ান,” প্রমথ আর চুপ করে থাকতে পারল না। “আপনি একটা অবাস্তব কথা বলছেন! খুনী অরেঞ্জ জুসে বিষ মিশিয়েছিল, সেটা যদিও বা সম্ভব হয়। কিন্তু দৌড়ে গিয়ে আবার আলো নিভিয়ে এসে সেই গ্লাসটা সরিয়ে অন্য একটা গ্লাস মাসুদ সাহেবের সামনে রাখাটা ইম্পসিবল।”

“আমারও তাই বিশ্বাস স্যার।”

“তাহলে?”

“আপনি যে যুক্তি দিলেন, সেটা ভেবেই আমারও তাই মনে হয়েছে স্যার, খুনীর একজন সাহায্যকারী ছিল।”

“আপনি বলতে চান যে সাহায্যকারী এমন ভাবে দু’বার বাতি নিভিয়েছিল যাতে খুনী তার কাজগুলো করতে পারে আশেপাশের লোকদের সন্দেহ না জাগিয়ে - তাইতো?” এবার তারেক প্রশ্ন করল।

“দুবারই যে সাহায্যকারী বাতি নিভিয়েছিল, তা আমি বলছি না স্যার, কিন্তু টাইমিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। শুধু তাই নয় স্যার, যাঁরা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত তাঁরা মামুদ সাহেবদের বাড়িটা ভালো করে জানেন - তাঁদের বাড়ির ভেতরে দেখলে, বাড়ির কারো কোনও সন্দেহ হবে না।”

“তারমানে বাড়ির কাজের লোক এর মধ্যে জড়িত?” এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“তাতো বলিনি স্যার। তবে সেটা নিশ্চয় একটা পসিবিলিটি, কিন্তু প্রবাবিলিটি নয়।”

“আচ্ছা, তোমরা ওঁকে বলতে দেবে?” ফ্র্যান্সিস্কা আমাদের সবাইকে একটু বকুনি দিল। তারপর একেনবাবুকে বলল, “এবার বল ডিটেকটিভ।”

“থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম, আমার নিজের বিশ্বাস খুনী প্রথমবার নিজেই একটা অরেঞ্জ জুসের গ্লাস নিয়ে সার্কিট ব্রেকারটা অফ করেছিলেন। সেই সময়েই তিনি সবার আড়ালে সেই জুসে বিষটা মেশান। মামুদ সাহেব যখন গেলেন কি হয়েছে দেখতে, তাতে যে সময়টুকু লাগলো, সেই সময়ের মধ্যে তিনি ফিরে এসে অন্ধকারে মাসুদ সাহেবের গেলাসটা সরিয়ে বিষের গেলাসটা সামনে রেখে দেন। তারপর মাসুদ সাহেব যখন সেটা খান, তার অল্পক্ষণের মধ্যেই আলো আবার নিভে যায়। এবার আলোটা নেভে ওঁর এক সাহায্যকারী ব্রেকারটি অফ করেন বলে। মামুদ সাহেব আবার ছোটেন সার্কিট ব্রেকার বক্সের দিকে। কিন্তু যাবার পথে মিস্টার খান আর সিঁড়ির ঘরে মালী রহিমকে ছাড়া কাউকে দেখতে পান না। আর আগেই বলেছি সেই সময়ে খুনী মাসুদ সাহেবের গেলাসটা আবার পাল্টে দেন। মামুদ সাহেবের বিষক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। তিনি যখন ঢলে পড়ে যাচ্ছেন, তখন খুনী চট করে সেই বিষাক্ত জুসটা পাশে একটা ফুলের টবে ফেলে দেন, যাতে কোনও মতেই সেটা ভুলে আর কেউ না খান, বা পুলিশের হাতে পরীক্ষার জন্য না যায়।”

“কিন্তু এটাই যে ঘটেছিল, সেটা আপনি বুঝলেন কি করে?” প্রমথ একটু বিরক্ত হয়েই বলল।

“কারণ স্যার খুনী অরেঞ্জ জুসটা হাইড্রেঞ্জিয়ার টবে ফেলেছিলেন।”

“সো হোয়াট?”

“ফলে হাইড্রেঞ্জিয়া ফুলের রঙটা পাল্টে গেল।”

“কি বলছেন মশাই যাতা!” এবার প্রমথ বলল।

“ঠিক কথাই বলছি যার। আপনি খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু বাপীবাবু দেখেছেন, সমস্ত সাদা আর আবছা পিঙ্ক রঙের হাইড্রেঞ্জিয়া ফুলের মধ্য শুধু একটার রঙ শুধু নীল। আর সেই নীল রঙের হাইড্রেঞ্জিয়াটা স্যার পার্টির দিন ছিল না। আমি খুব ভালো করে পার্টির সময়ের ছবিগুলো দেখেছি আপনারাও দেখেছেন। ছিল কি? আমি মামুদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোনো নতুন ফুলগাছ আনা হয়েছে কিনা। উত্তর স্যার, না। টবের মাটিগুলো আসে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে, যেখানে মাটিতে অ্যালুমিনিয়াম প্রচুর আছে। আমি জানি স্যার, আমার এই গাছপালার খ্যাপামি নিয়ে আপনারা হাসাহাসি করেন। কিন্তু জানেন স্যার, হাইড্রেনজিয়া গাছ যদি অ্যালুমিনিয়াম কম্পাউণ্ড শরীরে টেনে নিতে পারে, তাহলে তার ফুলের রঙ হয়ে যায় নীল। কিন্তু সেটা তখনই পারে যখন মাটি অম্লযুক্ত বা অ্যাসিডিক হয়। যেই মুহূর্তে অরেঞ্জ জুস টবের মধ্যে পড়ল, সেই টবের মাটি হয়ে গেল অ্যাসিডিক, আর হাইড্রেঞ্জিয়াও তার রঙ পাল্টালো - হয়ে গেল নীল। সমস্ত পিঙ্ক হাইড্রেঞ্জিয়ার মধ্যে হঠাৎ স্যার ঐ নীল রঙ দেখে আমি ভাবছিলাম, কেন একটা টবের মাটি

অ্যাসিডিক। টবগুলো সব টেনিস কোর্টের পাশে, সুতরাং সেখানে জুসটা ফেলার সম্ভাবনা প্রচুর।"

"কিন্তু অন্য কেউওতো তাঁদের জুস কোনও কারণে টবে ফেলতে পারে?" প্রমথ প্রশ্ন তুলল।

"তা পারে স্যার, সেইটে জানতেই আমি ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সাহায্য নিয়েছিলাম। তিনি বাংলাদেশের কনসুলেট জেনারেলের বলে বাংলাদেশের পুলিশকে দিয়ে নীল রঙের হাইড্রেঞ্জিয়ার টবটা পরীক্ষা করতে বলেন।

সেইখানে পটাশিয়াম সায়ানাইড ট্রেস পাওয়া গেছে। সেটাই হল ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের খবর।"

"মাই গড্ !" আমি বললাম।

"কিন্তু কে এই কাজটা করলেন?" তারেক প্রশ্ন করল।

"এবারতো আমার থিওরির কথা এসে গেল স্যার।"

"পসিবিলিটিতো তিনজন, আমি বললাম, মামুদের জামালচাচা, মিস্টার খান আর কবীর - আজিজুল সাহেবকে আমি বাদ দিচ্ছি।'

"চমৎকার স্যার। আর সহকারী কে?"

"গোয়েন্দাতো আপনি মশাই।" প্রমথ বলল।

“আমার ধারণা স্যার খুনী হলেন, মামুদসাহেবের জামালচাচা। তিনিই প্রথমে গিয়ে সার্কিট ব্রেকার অফ করেছিলেন। মামুদসাহেব যখন বাড়িতে ঢোকেন, তখন বাথরুমের সামনে জামালচাচার সঙ্গে ওঁর দেখাও হয়। মামুদ সাহেব সার্কিট ব্রেকার যেদিকে আছে সেদিকে হাঁটা দিতেই জামালচাচা বিষাক্ত জুসটা হাতে নিয়ে পার্টির দিকে চলে আসেন। সেখানে এসে গ্লাসটা মাসুদ সাহেবের সামনে রেখে আলো জলতেই মাসুদসাহেবকে একটা টোস্ট দেন। টাইমিংটা এমন ভাবে করা হয় যে, টোস্টের পরপরই আবার আলো নিভে যাবে। জামালচাচার সাহায্যকারীর দৌলতে স্যার, সেটা যায়ও। সেই সুযোগে জামালচাচা বিষাক্ত গেলাসটা সরিয়ে মাসুদ সাহেবের প্রথম গেলাসটা ওঁর সামনে রেখে দেন।”

“সাহায্যকারীটি কে?” তারেক জিজ্ঞেস করল।

“মিস্টার খান,” প্রমথ বলল।

“না স্যার। দ্বিতীয়বার আলো নেভার আগে মিস্টার খান বাড়িতে ঢুকেছিলেন ঠিকই এবং খুব দ্রুত হেঁটে বেরিয়ে আসছিলেন। কিন্তু তিনি যত দ্রুতই হাঁটুন, এমনকি তিনি দৌড়লেও সার্কিট ব্রেকার অফ করে বাড়ির বাইরে এসে মামুদ সাহেবের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব ছিল না স্যার। তিনি সার্কিট ব্রেকারটা অফ করেন নি। যিনি সার্কিট করেছিলেন, তিনি সাইডের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পার্টিতে চলে আসেন।”

“তাতো বুঝলাম কিন্তু লোকটি কে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না স্যার, জামলচাচা মামুদসাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ওঁর আম্মা কোথায়? সেটা কিন্তু একটা সাধারণ প্রশ্ন নয়, জামালচাচা সিওর হতে চাচ্ছিলেন যে, ওঁর অ্যাসিস্টেন্ট ঠিকমত জায়গায় রয়েছেন কিনা। যেই মুহূর্তে তিনি জানলেন যে, আম্মা বাড়িতে এসে গেছেন উনি দ্রুত পার্টির দিকে গেলেন। আসলে পুরো ব্যাপারটাই ভালো ভাবে প্ল্যান করা ছিল।”

প্রমথ বলল, “অফ অল দ্য পিপ্‌ল আম্মা? হোয়াই?”

আমিও বললাম, “যাই বলুন আপনি, আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারটা ক্লিয়ার হচ্ছে না। কোথাও একটা ফাঁক আছে। খুনের মোটিভতা কি? সুখ বা অর্থ কোনোটাই নয়। মামুদের কাছেই শুনেছি যে ওর বাবার মৃত্যু জামলচাচাকে বিধ্বস্ত করেছে - আর্থিক ও মানসিক দুভাবেই। আম্মারও আর্থিক দিক থেকে বিরাট লাভের কোনও সম্ভাবনা দেখছি না।”

“ইউ আর রাইট স্যার। এটা আমাকেও বদার করেছে স্যার, বদারড্‌ মি এ লট। তারপর আমার মনে হল, এর একটা ব্যাখ্যা আছে স্যার। সেইটেই এখন ঢাকার পুলিশকে অনুসন্ধান করে দেখতে দেখতে হবে - ঠিক কিনা।”

“ব্যাখ্যাটা বলুন।”

“প্রথমত: স্যার হত্যাকাণ্ডটা, অর্থের জন্য নয় স্যার, আমার ধারণা প্রেমের জন্য।”

“হোয়াট ?”

“হ্যাঁ স্যার, আমার মনে হয় মামুদ সাহেবের আম্মা আর জামলচাচার মধ্যে প্রেম ছিল। মামুদসাহেবের আম্মা মাসুদ সাহেবের কাছে তালাক চেয়েছিলেন। কিন্তু মাসুদ সাহেব দিতে রাজি হন নি। ইসলামিক আইনে স্যার স্বামীর তালাক দেবার অধিকার আছে, কিন্তু স্ত্রীর অত সহজে স্বামীর কাছ থেকে ডিভোর্স পাওয়াটা সহজ নয়। মাসুদসাহেব নিশ্চয় সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন যে, জামালসাহেবের সঙ্গে স্ত্রীর প্রেম আছে, ফলে মানসিক ভাবে কষ্টও পাচ্ছিলেন। জামলসাহেব আর আম্মা যখন বুঝলেন কোনওমতেই মাসুদ সাহেব আম্মাকে ছাড়তে রাজি হবেন না, তখন এই মার্ডারের প্ল্যানটা করেন। কাম একটা আদিম রিপু স্যার, মানুষ অনেক রকম অদ্ভুত কাজ এর তাড়নায় করে ফেলতে পারে স্যার।”

“এটা নিশ্চয় একটা ব্যাখ্যা - যদিও ধোপে নাও টিঁকতে পারে, আমি বললাম, কিন্তু এরজন্য জামালচাচার মানসিক অশান্তি বা অর্থকষ্টের ব্যাখ্যাটাতো পেলাম না।”

“ইয়েস স্যার। এইবার বলি, কেন সেটা হয়েছে বলে আমার সন্দেহ। এইটে যদি পারফেক্ট ক্রাইম হত, তাহলে কোনও সমস্যাই ছিল না। কিন্তু একজন যিনি মাসুদ সাহেবের টেবিলে বসে ছিলেন, তিনি জামালচাচচার এই গেলাস সরানোটা অন্ধকারেও দেখে ফেলেন এবং যেই মুহূর্তে মাসুদ সাহেব মুখ বিকৃত করেছেন, সেই মুহূর্তে তিনি অনুমান করতে পারেন - একটু পরে কি ঘটবে। অর্থাৎ আবার আলো নিভবে। তখন তিনি দ্রুত ছোটেন বাড়ির দিকে।

হলঘরে ঢুকে তিনি দেখতে পান আম্মা ঢুকছেন সার্কিট ব্রেকার যে ঘরে আছে সেখানে। তিনি দ্রুত ফিরে আসেন পার্টিতে। তখন আলো আবার নিভে গেছে। কিন্তু এই ভদ্রলোক অতি ধুরন্ধর। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন দ্বিতীয় আলো নেভার সময়ে কি ঘটেছে। এরপর ওঁর ব্ল্যাকমেল করা শুরু হয় জামালচচাচাকে। এঁর অর্থের প্রয়োজন মেটাতে জামালচাচা তাঁর সর্বস্ব খোয়ান। এবার আর ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারদের সমস্যা নয়, এটা হল মার্ডার চার্জ। সুতরাং মিস্টার খান এর জন্য কয়েক কোটি টাকাই দাবি অবশ্যই করতে পারেন।"

আমরা সবাই চুপ।

একেনবাবু বললেন, "ঢাকা পুলিশ এখন জামালচাচার সমস্ত কাগজপত্র সিল করে দেখছে কোথায় ওঁর টাকা গেছে, আর খান সাহেবের টাকাকড়ির হিসেব নিকেশ করছে। দুটো মিলে গেলেই আমার মনে হয় এই হত্যাকাণ্ডের সুরাহা হবে।"

ফ্র্যান্সিস্কা হাততালি দিয়ে বলল, "ডিটেকটিভ ইউ আর ব্রিলিয়ান্ট!"

(গল্পের নামকরণ দেখে পাঠকরা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, একেনবাবুর থিওরিতে কোনও ভুল ছিল না। শেষ খবর: ঢাকার পুলিশ আম্মা, জামালচাচা আর মিস্টার খান তিনজনেকেই গ্রেফতার করেছে।)

এই পিডিএফটি তৈরি করেছেন BIRONJEET ROY

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books) এর সৌজন্যে।

এধরণের আরও পিডিএফ পেতে ভিসিট করুন

banglapdf.net।

আর বইসংক্রান্ত যে কোন আলোচনার জন্য জয়েন করুন

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books) গ্রুপে। এই গ্রুপ শুধুমাত্র বইপ্রেমী মানুষের জন্য। আপনার পড়া বই সম্পর্কিত কোন তথ্য এই গ্রুপে দিতে পারেন। অথবা কোন বইয়ের পিডিএফ লিঙ্ক, রিভিউ-ও দিতে পারেন এখানে। বর্তমানে পাঠক-লেখকদের এক আশ্চর্য মিলনস্থলে পরিণত হয়েছে এই গ্রুপ। একইসাথে ঘুরে আসুন banglapdf সাইটের গ্রুপ BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট) এ।

বিঃদ্র- পিডিএফটি আপনারা যেখানে খুশি, যতবার খুশি শেয়ার করতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে কার্তেসি দিলে ভাল হয়, না দিলেও আমার কিছু বলার নেই। শুধু নিজেদের নামে চালিয়ে দিয়েন না।